


www.banglainternet.com

represents

POROMANU-SOKTI



পরমাণু-শক্তি

সুব্রত বড়ুয়া

banglainternet.com

ভূমিকা

আমার লেখা ‘পরমাণু-শক্তি’ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে, আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে। বইটি দীর্ঘদিন ধরে বাজারে ছিল না। গ্লোব লাইব্রেরি (প্রাঃ) লিমিটেড-এর কর্তৃপক্ষ এটির নতুন সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগ নিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বাংলা ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলাম এদেশের সাধারণ পাঠক ও শিশু-কিশোরদের কথা মনে রেখেই। বাংলা ভাষায় পাঠ-বহির্ভূত বিজ্ঞানের বই খুব একটা কম লেখা হয়নি। কিন্তু তাতেও আমাদের প্রয়োজন পূরণ হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আরো বহু বিষয়ে আরো বহু বই চাই। সে কাজে বিজ্ঞানলেখকরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন। তবে একই সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে পাঠকসমাজ, প্রকাশক ও ক্রেতাদের। চাহিদা থাকলে সৃষ্টির তাগিদও তৈরি হয়, লেখকরাও অনুপ্রাণিত হন। লেখার প্রেরণাও সৃষ্টি হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের বইয়ের চাহিদা প্রত্যাশিত পরিমাণের অনেক কম। সামগ্রিকভাবে বইয়ের বিক্রিও কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা লেখকদের জন্য চরম হতাশাজনক। তবু সে বই লেখা হয় এবং প্রকাশকরা বই ছাপেন তা বিস্ময়ের ব্যাপার বলেই মাঝে মাঝে মনে হয়। ‘পরমাণু-শক্তি’ পাঠকদের ভালো লাগলে আনন্দিত হবো।

সুব্রত বড়ুয়া

banglainternet.com

লস আলামোস র‍্যাঞ্চ স্কুল

১৯১৮ সালে আলফ্রেড জে. কোনেল নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার নিউ মেক্সিকোর জোমেজ পর্বতমালার পাজারিটো লিটল বার্ড মালভূমির একটি মেসায় (মালভূমির সমতল ক্ষেত্র) লস আলামোস র‍্যাঞ্চ স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্কুলটি অবস্থিত ছিল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭০০০ ফুট উচ্চতায়। মেজর কোনেল রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে জায়গাটি বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। প্রকৃতির বৈচিত্র্যের সাথে সঙ্গতি রেখে এই বোর্ডিং স্কুলটি বেশ ভালোই চলছিল। কিন্তু ১৯৪২-এর শরৎকালে এখানে এক নতুন দৃশ্যের অবতারণা হয়। ইউনিফর্ম-পরিহিত ড্রাইভার-চালিত একটি গাড়ি উঠে এলো অই মেসায়। গাড়িটি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও কোথাও দাঁড়াল না, কেবল এগিয়ে এলো ধীরে ধীরে, এলোমেলোভাবে ঘুরে-ফিরে দেখল এদিক-ওদিক, তারপর আবার চলে গেল। গাড়িতে চালক ছাড়াও আরোহী ছিলেন আরো চারজন - পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট জে. ওপেনহাইমার, জেনারেল গ্লোভস এবং তাঁর দুজন অ্যাডজুট্যান্ট।

জায়গাটি জেনারেল গ্লোভস-এর পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু অসুবিধাও ছিল অবশ্য সেখানে। পাহাড়ের তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরে খাড়া রাস্তা বেয়ে উঠে আসতে হবে এখানে। ভারী মালবাহী গাড়িগুলো এই পাহাড়ি পথ বেয়ে ওপরে উঠতে পারবে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ফেরার পথে জেনারেল গ্লোভস বেশ কয়েকটি স্থানে গাড়ি থামিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন—তিনটি সমস্যা তাঁকে মোকাবেলা করতে হবে এখানে : পথের দুর্গমতা, বাসস্থানের অভাব এবং জলকষ্ট। জেনারেল গ্লোভস ধারণা করেছিলেন—এখানে হয়ত প্রায় একশো জন বিজ্ঞানী ও তাঁদের পরিবার থাকবেন। পরে হয়ত কয়েকজন প্রকৌশলী ও মেকানিক তাঁদের সাথে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু জেনারেল গ্লোভস-এর ধারণাটি ভুল ছিল। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই লস আলামোস-এ কর্মরত বিজ্ঞানী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় সাড়ে তিন হাজার। আরো এক বছর পর এই সংখ্যা পৌঁছে যায় হ'হাজারে।

কিন্তু লস আলামোস-এ কি ঘটতে যাচ্ছিল তা র‍্যাঞ্চ স্কুলের হেডমাস্টার সেদিন মোটেই বুঝতে পারেন নি। বুঝতে পারলেন সেদিন, যেদিন সহকারী সমর-সচিব জন ম্যাকক্লয় কর্তৃক লস আলামোস হুকুম দখলের আদেশটি তিনি পেলেন। হুকুম দখলের আদেশটি জারি করা হয় ১৯৪২-এর ২৫শে নভেম্বর তারিখে। এর কয়েকদিন পরই জায়গাটি পরিষ্কার করার জন্য শ্রমিকদের প্রথম দলটি এখানে এসে পৌঁছে। এরপর

অপরীক্ষিত নতুন মারণাস্রটি। তাঁদের চোখে কালো কাচের চশমা এবং মুখে সূর্যোত্তাপ থেকে ত্বক রক্ষাকারী ক্রিম। ক্যাম্পের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসানো লাউড স্পীকারে তাঁরা নৃত্য-সঙ্গীতের অবিরাম বাজনা শুনতে পাচ্ছিলেন। নিম্পাদন মরুর আদিগন্ত শূন্যতায় এই বাদ্যধ্বনি যেন সর্বগ্রাসী মূর্ছনায় ঝঙ্কৃত হচ্ছিল। মাঝে মাঝে শুধু বাদ্য ধামিয়ে ধোষণা করা হচ্ছিল প্রস্তুতির অগ্রগতি। পয়েন্ট জিরোর প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে নিয়ন্ত্রণভবনে ছিলেন জেনারেল গ্রোভস এবং প্রকল্পের বিশ জন বিজ্ঞানী। ঠিক করা হয়েছিল বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে ঠিক ভোর চারটায়। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে পিছিয়ে নেওয়া হল সময় এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, সকাল সাড়ে পাঁচটায় বিস্ফোরণ ঘটানো হবে।

পাঁচটা বাজার দশ মিনিট পর থেকেই সময়-সঞ্চেত দিতে শুরু করেন ওপেনহাইমারের প্রথম সহকারী বিজ্ঞানী সল কে. এলিসন। কাটতে লাগল প্রতীক্ষার সেই চরম উত্তেজনাময় অসহনীয় মুহূর্তগুলো। তারপর সবকিছু ঘটে গেল নিমেষের মধ্যে। কিছু বুঝতে পারার আগেই যেন সব শেষ হয়ে গেল। পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রথম দৃষ্টি কেউ দেখতে পান নি, দেখেছেন শুধু আকাশে ও পাহাড়ের পায়ে তার চোখ-ধাঁধানো স্বেত প্রতিফলন। তারপর যারা সাহস করে মুখ ঘুরিয়েছিলেন, তাঁরা দেখতে পান একটি অত্যাঙ্কুল অগ্নিবলয়, যা কেবল প্রসারিত হয়েছেই চলেছে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শক্তি দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন সবাই। নিয়ন্ত্রণ-কক্ষের একটি ষ্টিটি জড়িয়ে ধরেন ওপেনহাইমার। জেনারেল ফ্যারেল তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এভাবে :

“গোটা অঞ্চলটি মধ্যাহ্ন সূর্যালোকের চাইতে বহুগুণ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে। ...বিস্ফোরণের ত্রিশ সেকেন্ড পরেই একটা প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহের চাপ অনুভূত হয় এবং তার প্রায় অব্যবহিত পরেই যে বিকট দীর্ঘস্থায়ী ও ভীতিপ্রদ আওয়াজ শুনতে পাই, তা যেন আমাদের মহাপ্রলয়ের দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এতোদিন পর্যন্ত প্রকৃতির যে সুন্দর শক্তি ছিল পরমপুরুষের নিয়ন্ত্রণে তা নিয়ে নাড়াচড়া করার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছিল। এই দৃশ্য ও শব্দ যে দৈহিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা প্রকাশের জন্যে ভাষা একটি নিতান্তই অপ্রতুল হাতিয়ার। অভিজ্ঞতা ছাড়া এর উপলব্ধি অসম্ভব।”

পরমাণু বোমার প্রথম শিকার

১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট সকাল নাটায় জাপানের খ্যাতনামা পরমাণু-বিজ্ঞানী য়োশিও নিশিনার গবেষণাগারে এলেন জাপানী স্বর্ণবাহিনী বিমান বিভাগের একজন অফিসার। মিত্রবাহিনী তথা মার্কিন ক্রিমান আক্রমণে গবেষণাগারটিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অফিসারটি নিশিনাকে অনুরোধ করেন তখনি তাঁর সাথে জেনারেল স্টাফ হেডকোয়ার্টারে যেতে। নিশিনা তাঁর সহকর্মীদের বলে দিচ্ছিলেন কি কি কাজ করতে হবে তাঁর অনুপস্থিতিতে। সেই সময়ে এসে হাজির হলেন সরকারি বার্তা সংস্থা ডোসেই-এর একজন রিপোর্টার। তিনি জানতে চাইলেন, মার্কিন বেতারে হিরোশিমার

১৯৪৩-এর মার্চ মাসেই পরমাণু-বিজ্ঞানীদের প্রথম দলটি এখানে এসে উপস্থিত হন। হ্যাঁ, পরমাণু-বোমা আবিষ্কারের দুরূহ কাজটিই শুরু করা হয়েছিল এখানে। প্রকল্পটির কোড নাম ছিল 'ম্যানহাটন প্রজেক্ট'। সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত এই প্রকল্পটির সাথে জড়িত হয়েছিল প্রায় দেড় লক্ষ কর্মী। কিন্তু প্রকল্পটির উদ্দেশ্য এতোই গোপন রাখা হয়েছিল যে, সর্বমোট মাত্র ডজন খানেক লোক এর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের রূপটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। প্রকল্পটির প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন জেনারেল লেসলি গ্রোভস। আর পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার ছিলেন লস আলামোস গবেষণাগারের পরিচালক।

পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ

লস আলামোস গবেষণাগারে তৈরি করা হচ্ছিল তিনটি পারমাণবিক বোমা। কিন্তু নির্মাতা বিজ্ঞানীরা আগে থেকে ঠিক বুঝতে পারেন নি পারমাণবিক বোমার ধ্বংসক্ষমতা কী ভয়াবহ হতে যাচ্ছে। পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের আগে তাই তাঁরা অনেকেই একে অন্যের সঙ্গে এ নিয়ে বাজিত ধরেছিলেন। এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের কোড নাম দেওয়া হয়েছিল 'ট্রিনিটি'। কেন নামটিই বেছে নেওয়া হয়েছিল তার উত্তর কেউ দেন নি। তবে এ সম্পর্কে দুটি অনুমানের একটি হচ্ছে—লস আলামোসের অদূরেই ট্রিনিটি নামে একটি খনি ছিল। খনিটি 'অভিশপ্ত' মনে করে রেড ইন্ডিয়ানরা সেটি এড়িয়ে চলত। এই খনির নামানুসারেই বিজ্ঞানীরা তাঁদের প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ কর্মসূচির কোড নাম দিয়েছিলেন 'ট্রিনিটি'। আর দ্বিতীয় অনুমানটি হচ্ছে—সেই সময় প্রথম তিনটি বোমারই নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আর তাই অভিশপ্ত ত্রয়ীর অনুসরণেই এই 'ট্রিনিটি' নামকরণ।

১৯৪৫-এর ১২ই জুলাই শুরুর পরীক্ষামূলক বোমার অভ্যন্তরীণ অংশগুলো লস আলামোস থেকে পেছনের দরজা দিয়ে অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। লস আলামোস-এর কোড নাম 'সাইট এস' থেকে যুদ্ধকালে নির্মিত একটি গোপন সড়ক দিয়ে এগুলো পাঠানো হয় জর্নাদা দেল ময়ুরতো (মৃত্যু প্রাপ্তরা) এলাকায়। বিস্ফোরণ ঘটানোর পূর্বে বোমাটি স্থাপনের জন্য মরুভূমির মাঝখানে লোহার ফ্রেমের একটি উঁচু মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের কারণে যাতে কোনো অভাবিতপূর্ব দুর্ঘটনা না-ঘটে যায় সেজন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, একেবারে সম্ভাব্য শেষ মুহূর্তে মঞ্চে বোমাটি স্থাপন করা হবে। এর আগে মঞ্চের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েকদিন পূর্বে সাধারণ বিস্ফোরকপূর্ণ একটি মেকি বোমা মঞ্চের ওপর রাখা হয়েছিল। বজ্রপাতের ফলে পলয়ঙ্করী শক্তির সঙ্গে সেটি বিস্ফোরিত হয়। মঞ্চটির সাংকেতিক নাম দেওয়া হয়েছিল 'পয়েন্ট জিরো'।

পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের জন্য নির্ধারিত দিনটিতে রাত দুটোর মধ্যেই বিস্ফোরণ কার্যে সংশ্লিষ্ট সবাই নিজ নিজ কর্তব্যস্থলে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সমবেত হয়েছিলেন পয়েন্ট জিরো থেকে দশ মাইল দূরবর্তী একটি বেস ক্যাম্পে। পয়েন্ট জিরোতে উঁচু মঞ্চে স্থাপিত হয়ে গেছে তাঁদের দু বছরের অক্লান্ত শ্রমে তৈরি এবং তখনো পর্যন্ত

হিরোশিমাতে যে বোমাটি ফেলা হয় সেটি ছিল ইউরেনিয়াম বোমা। বোমাটির সাক্ষাতিক নাম ছিল 'লিটল বয়'। এটি ছিল দশ ফুট লম্বা আর এর ওজন ছিল ৯০০০ পাউন্ড। এর শক্তি ছিল ১৬ কিলোটন (মতান্তরে ১২.৫ কিলোটন) টি-এন-টির সমান। এর প্রশস্ততম অংশটি ছিল ২ ফুট ৪ ইঞ্চি চওড়া। আর ৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে যেটি নিষ্ফলিত হয় সেটি ছিল প্লুটোনিয়াম বোমা। সাক্ষাতিক নাম 'ফ্যাট ম্যান'। সাজে দশ ফুট লম্বা এ বোমাটির প্রশস্ততম অংশটি ছিল পাঁচ ফুট চওড়া। ওজন ১০,০০০ পাউন্ড। এর শক্তি ছিল ২২ কিলোটন টি-এন-টির সমান।

পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণের ফলে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মারা যায় মোট প্রায় ১১ লাখ মানুষ। মাত্র দুটি বোমার আঘাতে এত বেশি মানুষের মৃত্যু থেকেই আমরা বুঝতে পারি পরমাণু-শক্তির ভয়াবহতা কি পরিমাণ বেশি। পরমাণু-বিস্ফোরণের পর বেরিয়ে আসে দু ধরনের রশ্মি। একটি হচ্ছে তাৎক্ষণিক বিকিরণ যার উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে গামা-রশ্মি ও নিউট্রন; এবং অপর অংশটি হচ্ছে তাপ-বিকিরণ। উচ্চশক্তির বোমার ক্ষেত্রে নির্গত শক্তির শতকরা চল্লিশ ভাগই উত্তাপ এবং আলো হিসেবে দেখা দেয়। এক সেকেন্ডের মধ্যেই তীব্র আলো এবং উত্তাপ ঐ অঞ্চলের ঘরবাড়ি, গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদির উপর এসে পড়ে। এর ফলে প্রধান যে ক্ষতিটা হয় তা হলো পুড়ে যাওয়া বা আগুন ধরে যাওয়া। হিরোশিমায় বিস্ফোরণ-স্থলের এক মাইলের মধ্যে সমস্ত পথচারীর শরীর কম-বেশি পুড়ে গিয়েছিল। আগুন ধরে গিয়েছিল জানালা-দরজার পর্দা, হাঙ্গা পোশাক ইত্যাদিতে। এই সময়ে তীব্র দু্যুতিতে ধাঁধিয়ে যাওয়ায় কয়েক সেকেন্ড কেউ নড়াচড়া করতে পারে নি। এ ছাড়া তাপ-বিকিরণের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল চোখের। সাময়িক এবং স্থায়ী অন্ধত্বের ঘটনা ছিল অসংখ্য।

পক্ষান্তরে তাৎক্ষণিক বিকিরণের প্রভাবও ছিল বেশ ব্যাপক। শরীরের ভিতরে গামা-রশ্মি ঢোকার ফলে শরীরের কোষ-এর প্রোটিন ভেঙে যায় এবং কোষ-এর স্বাভাবিক কাজ বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমে রক্তে এই দুর্ঘটনার ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। হাড়ের মজ্জার ক্রিয়া কমতে থাকে। রক্তে শ্বেত কণিকা দ্রুত হ্রাস পায়; পরে লোহিত কণিকারও অভাব ঘটে। এবং আক্রান্ত ব্যক্তি এগিয়ে যায় অবধারিত মৃত্যুর দিকে।

হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরমাণু-বিজ্ঞানীরা এই বোমার ক্ষতিকর প্রভাবের দিকটি নানাভাবে বিবেচনা করে দেখেন। তাঁদের অনুসন্ধান থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে ক্ষতি হয় প্রধানত চার ভাবে। এক- বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয় 'ঘাত-তরঙ্গ' বা 'শক ওয়েভ'। ঘাত-তরঙ্গের প্রভাবে বিস্ফোরণ-স্থলের চারপাশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে হাওয়ার প্রচণ্ড আলোড়ন। এর ফলে চার পাশে আধমাইল ব্যাপী এলাকার প্রায় সবকিছু ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। যেমন একটি কুড়ি কিলোটন বোমার বিস্ফোরণে যে ঘাত-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাতে বিস্ফোরণ-কেন্দ্রের হাজার ফুট দূরেও প্রচণ্ড চাপে মানুষের বুক এবং পাজরের হাড় গুড়িয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষতি হচ্ছে প্রচণ্ড তাপ-

ওপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে যে ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে প্রফেসর নিশিনা তা বিশ্বাস করেন কিনা।

খবরটি শুনেই দারুণ আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন নিশিনা। জাপানের অধিকাংশ মানুষের মতো হিরোশিমার মর্মভূদ ঘটনা সম্পর্কে তিনিও তখন কিছুই জানতেন না। প্রফেসর নিশিনা ফ্যাকাশে মুখে কাঁপা গলায় বললেন, 'খুব সম্ভব, ঘোষণাটি সত্য।' তারপর তিনি সামরিক অফিসারটির সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

ঘোষণা যে সত্য এ-কথা নিশিনার চেয়ে বেশি আর কে জানত তখন জাপানে! তাঁর ছোট্ট গোলগাল হাসিখুশি সুন্দর মুখটি ছিল পৃথিবীর সর্বত্র পরমাণু-বিজ্ঞানীদের কাছে সুপরিচিত ও সমাদৃত। এই শতকের বিশেষ দশকে তিনি কাজ করেছিলেন নীলস বোর-এর অধীনে কোপেনহাগেনে। বোর-এর অন্য এক ছাত্রের সাথে মিলে সেখানে তিনি 'নিশিনা ফর্মুলা' আবিষ্কার করেন। কোপেনহাগেন থেকে জাপানে ফিরে আসার পর তিনি পরমাণু-বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন। পারমাণবিক শক্তির ধ্বংসলীলা সম্পর্কে তাই তিনি জাঁচ করতে পেরেছিলেন সহজেই। আগস্টের সাত তারিখে জাপানের জেনারেল স্টাফের ডেপুটি চীফ কাতোয়াবে যে দ্বিতীয় তারবার্তাটি পান তাতে সবচেয়ে দুর্বোধ্য বাক্যটি ছিল : গোটা হিরোশিমা শহরটি একটি মাত্র বোমার আঘাতে নিমেষে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।

পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণের সংবাদে দারুণভাবে মর্মান্বিত হয়েছিলেন ইউরেনিয়াম বিভাজনের আবিষ্কর্তা জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর মাত্র কয়েক মাস আগে অটো হান এবং তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানী লিজে মাইটনার সাইক্লোট্রন থেকে পাওয়া দ্রুতগতি সম্পন্ন নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়াম ধাতুর পরমাণু বিভাজনে সক্ষম হন। তাঁরা দেখতে পান যে, এভাবে বিভাজিত হওয়ার সময় পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে প্রভূত শক্তি ছাড়া পায়। অটো হান ইউরেনিয়াম পরমাণু ভেঙে যে দুটি পরমাণু পেয়েছিলেন সে দুটির একটি ছিল বেরিয়াম এবং অপরটি ক্রিপটন।

অটো হান তখন বন্দি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানির শোচনীয় পরাজয়ের পর নাৎসীদের সহযোগী হিসেবে গ্রেপ্তার হন তিনি। হাইডেলবার্গ থেকে প্যারিসের নিকটবর্তী আমেরিকান পেশাল ট্রানজিট ক্যাম্প হয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রিটেনে। সেখানে কেমব্রিজের কাছে গডমানচেস্টারের এক বাড়িতে ব্রিটিশদের হাতে বন্দি অবস্থাতেই তিনি হিরোশিমায় পরমাণু-বোমা নিক্ষেপের এই ভয়াবহ দুঃসংবাদ পান। সেখানে অটো হানের সাথে বন্দি ছিলেন আরো নবীন পদার্থবিজ্ঞানী। এদের মধ্যে ছিলেন হাইসেনবার্গ, ওয়েজল্যাকার, হাটেক, বাগ, গেরলাখ, ম্যাক্স ফন লাউ প্রমুখ।

দুঃস্বপ্নের দিন

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দুটি অভাবনীয়রূপে ধ্বংস হয়েছিল পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে। ৬ই আগস্ট সকালে

গাণিতিকভাবে সূত্রটি $E = mc^2$ লেখা হয়। অর্থাৎ m ভরের একটি বস্তুর শক্তির পরিমাণ হবে ঐ ভরকে আলোর বেগ-এর বর্গ দ্বারা গুণ করলে যে ফল পাওয়া যাবে তার সমান। এই হিসাব থেকে দেখা যায়, খুব অল্প ভরের কোনো পদার্থ থেকেও আমরা বিপুল পরিমাণ শক্তি পেতে পারি। কিন্তু পরমাণু-শক্তি আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এই সমীকরণটির সত্যতা প্রমাণের কোনো সুযোগ ছিল না। এবং পরমাণু-শক্তি ছাড়া অন্য কোনো প্রকার শক্তিতে কোনো পদার্থ থেকে এই পরিমাণ শক্তি আমরা আহরণও করতে পারি না।

পরমাণু কথাটি এসেছে ইংরেজি অ্যাটম (atom) শব্দটি থেকে। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ কি দিয়ে তৈরি এ সম্পর্কে প্রাচীনকালে নানা দেশে নানা রকম মতবাদ চালু ছিল। কিন্তু পদার্থ যে পরমাণু বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা গঠিত এ মতবাদটি প্রথম প্রচার করেন গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস, যীশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় চারশো বছর আগে। তিনি বলেছিলেন, আমাদের চারপাশের সকল বস্তুই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সসীম বস্তুকণা দ্বারা গঠিত এবং এ-সব বস্তুকণাকে ভেঙে আর ছোট করা যায় না। তিনি এসব কণার নাম রাখলেন এ-টমোস্ (a-tomos)। গ্রীক ভাষায় 'এ-টমোস' বলতে বুঝায় এমন কণা যা আর ভেঙে ছোট করা যায় না। এই 'এ-টমোস' শব্দ থেকেই এসেছে ইংরেজি 'অ্যাটম' (atom) শব্দটি।

বস্তুর গঠন সম্পর্কে ডেমোক্রিটাসের বক্তব্যটি অবশ্য তেমন ব্যাপকভাবে গৃহীত হলো না। দার্শনিক অ্যারিস্টটল তো সরাসরি নাকচই করে দিলেন ডেমোক্রিটাসের এই প্রস্তাব। তিনি বললেন—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মাত্র চারটি মৌলিক পদার্থ আছে। আর এই চারটি মৌলিক পদার্থ হচ্ছে : আগুন, পানি, বাতাস ও মাটি। তখনকার দিনে অ্যারিস্টটল যা বলতেন সেটিই সত্য বলে মেনে নেওয়া হত। অতএব ডেমোক্রিটাসের 'পরমাণু' তলিয়ে গেল বিস্মৃতির অতলে। প্রায় দু'হাজার বছর পর বিজ্ঞানীদের উদ্যোগে পরমাণু শব্দটি ফিরে এলো আবার। ফিরে এলো রসায়নবিদদের মাধ্যমেই।

স্বর্ণমৃগয়া

প্রাচীনকালে রসায়নশাস্ত্রের চর্চা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল প্রধানত বিশেষ একটি কারণে। সে সময় অনেকেই মনে করতেন, কম দামি ধাতুপিত্তকে রাসায়নিক উপায়ে অত্যন্ত মূল্যবান স্বর্ণপিণ্ডে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এই কাজটি করতে গিয়ে যেমন গবেষণাগারের জন্য প্রয়োজনীয় নানা ধরনের যন্ত্রপাতি তাঁরা উদ্ভাবন করেন, তেমনি রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে অনেক তথ্যও তাঁরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। কিন্তু একটি সুশৃঙ্খল বিষয় হিসেবে রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠার পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন ফরাসি বিজ্ঞানী লাবোয়াসিয়ে। লাবোয়াসিয়ে-এর 'ট্রেইটে এলিমেন্টারি দ্য কিমি' বইটি প্রকাশিত হয় ১৭৮৯ সালে। এ বইটিতে তিনি রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় পদার্থের ওজন ও অন্যান্য গুণের পরিবর্তন

বিকিরণ যা আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রকারের ক্ষতি হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তাজনিত ক্ষতি। শক্তিশালী নিউট্রন রশ্মির প্রভাবে আশেপাশের সমস্ত সাধারণ জিনিসে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে এবং এসব জিনিস নিজেরাই মারাত্মক রশ্মি বিকিরণ করতে শুরু করে। এর ফলে নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে দীর্ঘস্থায়ী গামা-রশ্মি ও বিটা-রশ্মি উৎপন্ন হয়। এইসব তেজস্ক্রিয় রশ্মি যে কী রকম মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যায় হিরোশিমা-নাগাসাকির ঘটনায়। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে যেসব গর্ভবতী নারী তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবের মধ্যে পড়েছিল কিন্তু সজে সজে মারা যায় নি, পরে দেখা গেল তাদের মধ্যে শতকরা ২৫ জনের গর্ভপাত ঘটেছে। শতকরা ২৫ জনের সন্তান জন্ম লাভ করলেও এক বছরের মধ্যে সে-সব শিশুর মৃত্যু হয়। বিস্ফোরণ সন্নিহিত অঞ্চলের শিশু-মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেয়ে স্বাভাবিক হারের ৮ গুণ বেশি হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া যে-সব ছেলেমেয়ে বেঁচে রইল, দেখা গেল তাদের চার ভাগের এক ভাগ ছেলেমেয়ে কেবল ক্ষুদ্র মস্তিষ্কবিশিষ্টই হলো না, তারা আরো হলো মানসিক বিকৃতিসম্পন্ন।

পারমাণবিক বোমার এই ধ্বংসশক্তির বিবরণ প্রকাশ পাওয়ার পর থেকেই সাধারণ মানুষ পরমাণু-শক্তির প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিস্ময়ে হতবিস্মল হয়ে পড়ে। পরমাণু-শক্তি সম্পর্কে মানুষের ধারণায় সূচিত হয় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কী এই পরমাণু? কিভাবে ঘটে এই পারমাণবিক বিস্ফোরণ? মানুষের মনে জেগে ওঠে এমনি হাজারো প্রশ্ন।

পরমাণুর প্রথম কলি

পরমাণু-শক্তি কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে যে বিস্ময়বোধের সৃষ্টি হয়, তার উত্তর পাওয়ার আগে শক্তি বলতে আমরা কি বুঝি—সে কথাটি জানা দরকার। পদার্থবিজ্ঞানের যে কোনো পাঠ্যপুস্তকে শক্তি কথাটির যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাতে বলা হয়েছে : কোনো বস্তুর কাজ করার ক্ষমতাকে শক্তি বলে। অর্থাৎ শক্তি হচ্ছে কাজ করার সামর্থ্য। শক্তি আমরা নানাবিধে পেয়ে থাকি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শক্তির বিভিন্ন ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। যেমন তড়িৎ-শক্তির সাহায্যে আমরা বৈদ্যুতিক বাস্তু জ্বালিয়ে আলো পাই, পাখা চালিয়ে পাই বাতাস কিংবা হিটার জ্বলে পাই তাপ। অন্যদিকে যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে কল-কারখানা চলে, গাড়ি দৌড়ায়। এভাবে নানা ধরনের শক্তি আমরা প্রতিদিন আমাদের নানা কাজে ব্যবহার করি। কিন্তু শক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হলো—এক ধরনের শক্তিকে আরেক ধরনের শক্তিতে পরিবর্তন করা সম্ভব। এই পরিবর্তনকে বলে শক্তির রূপান্তর। আবার এই রূপান্তরের ফলে শক্তির কোনো ক্ষয়ও হয় না। এক রূপের যে পরিমাণ শক্তি হারায় অন্য রূপে তার সমপরিমাণ শক্তিই পাওয়া যায়। এই তত্ত্বের নাম শক্তির নিত্যতা সূত্র।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন পদার্থের ভর এবং শক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তার একটি সূত্র প্রদান করেন। সূত্রটি আইনস্টাইনের ভর-শক্তি সমীকরণ নামে পরিচিত।

বিক্রিয়ায় একটি অণুর সৃষ্টি অতএব বিভিন্ন পরমাণুর ওজন জানা থাকলে এই রাসায়নিক সংমিশ্রণের একটা গাণিতিক বিশ্লেষণ প্রদান সম্ভব। কিন্তু যে জিনিসটি চোখে দেখা যায় না, সেটি ওজন করা যাবে কিভাবে? অতএব যা করা যেতে পারে তা হলো—কোনো একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সাথে তুলনা করে এদের ওজন সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। ড্যান্টন তুলনা করার জন্য হাইড্রোজেনকেই বেছে নিলেন, কারণ হাইড্রোজেন সবচাইতে হালকা বস্তু। হাইড্রোজেন-এর একটি পরমাণুর ওজন এক ধরে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন নির্ধারণের প্রয়াস নিলেন তিনি। এভাবে বেশ কিছু মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন নির্ণয় করেছিলেন ড্যান্টন।

কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল, হাইড্রোজেন-এর সাথে তুলনা করে পরমাণুর তুলনামূলক ওজন বের করার মধ্যে বড় ধরনের একটি অন্তরায়ের সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ হাইড্রোজেন-এর সাথে অনেক মৌলিক পদার্থেরই রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না। পক্ষান্তরে অক্সিজেন-এর সাথে প্রায় সব ধরনের মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। অতএব প্রক্রিয়াটি সহজ করার জন্য অক্সিজেন-এর পরমাণুর সাথে তুলনা করার পদ্ধতিটিই বেছে নেওয়া হলো। হাইড্রোজেন-এর চাইতে অক্সিজেন ষোলো গুণ ভারী বলে অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ধরা হলো ষোলো।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রসায়নবিদরা পঁচাত্তরটির মতো মৌলিক পদার্থ চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। ১৮৬০ সালে জার্মানির কার্লসরুহতে প্রথম আন্তর্জাতিক রসায়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সর্বসম্মত পারমাণবিক ওজন নির্ধারণের ব্যাপারটি বিশদভাবে আলোচিত হয়। রুশ রসায়নবিদ মেন্ডেলিয়েভ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি পারমাণবিক ওজন সম্পর্কে ইতালীয় বিজ্ঞানী ক্যানিজারের বক্তৃতা শুনে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন।

কার্লসরুহ সম্মেলনের পরপরই মেন্ডেলিয়েভ পিটার্সবুর্গ ফিরে আসেন এবং পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন, সাতটি করে দল নিয়ে পারমাণবিক ওজনের ক্রমোচ্চতা অনুসারে সাজানো মৌলিক পদার্থগুলোর যোজনী বা ভেলেন্সি পর পর ১, ২, ৩, ৪, ৩, ২, ১—এমনি এক পর্যাবৃত্ত রূপ লাভ করে। তিনি আরো লক্ষ্য করলেন যে, একই রকম যোজনীবিশিষ্ট মৌলসমূহ একই উল্লম্ব স্তম্ভ বা কলাম বরাবর পড়ে এবং একই স্তম্ভভুক্ত মৌলগুলোর রাসায়নিক ধর্মে অনেক মিল পাওয়া যাচ্ছে। একইভাবে পারমাণবিক ওজন এবং রাসায়নিক ধর্মের উপর ভিত্তি করে একটি তালিকা তৈরি করলেন মেন্ডেলিয়েভ। তালিকাটি মেন্ডেলিয়েভ-এর পর্যায়-সারণি (Periodic Table) নামে পরিচিত হলো। ১৮৬৯ সালে মেন্ডেলিয়েভ তাঁর প্রথম সারণি প্রকাশ করেন। তাঁর কাজটি বিজ্ঞানী সমাজে আলোড়ন তোলে, কিন্তু সব বিজ্ঞানী এটি অনুমোদন করলেন না। কারণ মৌলিক পদার্থ বা মৌলগুলোকে যে নির্দিষ্ট কোনো নিয়মে সাজিয়ে এ ধরনের পর্যায়-সারণি তৈরি করা সম্ভব, এ ব্যাপারে অনেকের মনেই ছিল গভীর সন্দেহ। অবশ্য

ঘটে। ল্যভোয়াশিয়ে মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন, কোনো মৌলিক পদার্থকে ভেঙে বিভিন্ন রকমের সহজ বস্তুতে পরিণত করা যায় না। মৌলিক পদার্থের কণাগুলো একই ধর্মবিশিষ্ট। তিনি আরো দেখালেন, কোনো যৌগিক পদার্থকে ভেঙে বিভিন্নধর্মী বস্তুতে পরিণত করা যায়। এবং এইসব বিভিন্নধর্মী বস্তু দিয়েই যৌগিক পদার্থটি গঠিত। ল্যভোয়াশিয়ে তাঁর জীবনকালে পঞ্চাশটিরও বেশি মৌলিক পদার্থের তালিকা প্রণয়ন করেন।

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ল্যভোয়াশিয়ে এক যুগান্তকারী মৌলিক তথ্য তুলে ধরতে সক্ষম হন। এটি হলো : কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এক বস্তু অন্য বস্তুতে অথবা কোনো যৌগিক পদার্থ মৌলিক পদার্থগুলোতে অথবা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ মিলে একটা যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত হওয়ার সময় বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থগুলোর মোট ওজন কমে না, সমান থাকে। এই তথ্যকে বলা হয়—বস্তুর নিত্যতা বা সংরক্ষণ তত্ত্ব। এই তত্ত্ব নিয়ে পরবর্তীকালে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ মিলে যখন কোনো যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় তখন মৌলিক পদার্থগুলো সব সময় নির্দিষ্ট পরিমাণে মিলেই তা করে। উদাহরণস্বরূপ—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে যখন পানির সৃষ্টি হয় তখন ওজন হিসেবে সবসময়ই এক ভাগ হাইড্রোজেনের সাথে আট ভাগ অক্সিজেন মিলে। যৌগিক পদার্থ গঠনের ক্ষেত্রে মৌলিক পদার্থসমূহের এই অনুপাত সব সময় বজায় থাকে।

ল্যভোয়াশিয়ে-এর পর জন ডাল্টন বিভিন্ন গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরমাণুর অংশগ্রহণ সম্পর্কে একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। ডাল্টনের পরমাণু-তত্ত্বের তিনটি স্বীকার্য হচ্ছে :

১. প্রত্যেক ধরনের মৌলিক পদার্থ অতি সূক্ষ্ম, অখণ্ডনীয় নিরেট কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। এই কণিকাগুলোই হচ্ছে পরমাণু।
২. একই মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণু একই ওজনবিশিষ্ট। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন বিভিন্ন।
৩. পরমাণুর পারস্পরিক মিলনে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক পরমাণু মিলে একটি 'অণু'র সৃষ্টি করে। একটি নতুন যৌগিক পদার্থের অণুর সৃষ্টি হয়, দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সংযোগে। যেমন পানি একটি যৌগিক পদার্থ। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুই প্রকার মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সংযোগে পানির এক-একটি অণু সৃষ্টি হয়েছে।

পারমাণবিক ওজন ও পর্যায়-সারণি

জন ডাল্টনের এই তত্ত্ব থেকেই পাওয়া গেল আধুনিক বিজ্ঞানের পরমাণু তত্ত্বের ভিত্তি। ডাল্টনের বক্তব্যের মধ্যে এ-কথাটিও ছিল যে, যেহেতু, বিভিন্ন পরমাণুর রাসায়নিক

পরমাণুর গুজনের ১৮৪০ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু প্রতিটি কণাই বহন করেছে এক একক নেগেটিভ চার্জ। থমসন এদের নাম দিলেন ইলেকট্রন। তিনি প্রমাণ করলেন যে, ইলেকট্রনের প্রবাহই হচ্ছে বিদ্যুৎ-প্রবাহ। অন্য দিকে থমসনের এই আবিষ্কার থেকে প্রমাণিত হলো—পরমাণুর চেয়ে ১৮৪০ গুণ হালকা কণাও আছে। অতএব পরমাণুই বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক—এমন কথা বলা যায় না। তাই ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে থমসন কর্তৃক ইলেকট্রন আবিষ্কারের পর পরমাণুর গঠন সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে বিজ্ঞানীরা বললেন :

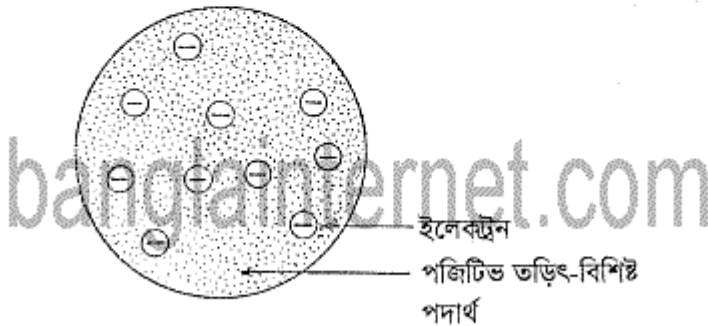
১. প্রতিটি পরমাণুতে ইলেকট্রন রয়েছে, এবং
২. যেহেতু প্রতিটি পরমাণু বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ, অতএব পরমাণুতে নেগেটিভ চার্জের পরিমাণ সমান হওয়া অত্যাবশ্যিক।

বিজ্ঞানীদের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা দিল আরো দুটি প্রশ্ন :

১. একটি পরমাণুতে কতগুলো ইলেকট্রন থাকতে পারে ; এবং
২. পরমাণুর মধ্যে পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জগুলো কিভাবে রয়েছে ?

পরমাণু-মডেল

থমসন নিজেই এগিয়ে এলেন এসব প্রশ্নের জবাব দিতে। তিনি উপস্থিত করলেন পরমাণুর একটি মডেল। থমসনের মতে পরমাণু একটি পজিটিভ বিদ্যুতের গোলক এবং মধ্যস্থলে ছড়িয়ে রয়েছে ইলেকট্রনগুলো। তাঁর মডেল অনুসারে কোনো পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন থাকলে (যেমন, হাইড্রোজেন পরমাণু) অই ইলেকট্রনটি থাকবে পজিটিভ বৈদ্যুতিক গোলকটির কেন্দ্রে ; আর দুটি ইলেকট্রন থাকলে (যেমন, হিলিয়াম পরমাণু) সে দুটি গোলকটির কেন্দ্রবিন্দুর দুপাশে এমনভাবে অবস্থান করবে যাতে ইলেকট্রন দুটির মধ্যে ব্যবধান গোলকটির ব্যাসার্ধের অর্ধেক হয়। অন্যদিকে তিনটি ইলেকট্রন থাকলে (যেমন, লিথিয়াম) ইলেকট্রনগুলো একটি সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি কোণের শীর্ষবিন্দুর উপর অবস্থান করবে এবং ঐ ত্রিভুজের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য



চিত্র ১ : থমসনের পরমাণু-মডেল

মেডেলিয়েভ তাঁর কাজটি যে নিখুঁতভাবে করতে পেরেছিলেন তা-ও নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৌলকে পারমাণবিক ওজন অনুসারে নির্দিষ্ট জায়গায় না-বসিয়ে অন্যত্র বসাতে হলো তাঁকে, যাতে তা সঠিক সারিতে সঠিক স্তম্ভে পড়ে। ফলে সারণিটিতে খালি স্থানও রয়ে গেল বেশ কিছু। পরবর্তীকালে নতুন মৌল খুঁজে পাওয়ার পর দেখা গেল—ক্রমশ এইসব শূন্যস্থানে সেগুলো বসানো যাচ্ছে। তবে মেডেলিয়েভ-এর পর্যায়-সারণির মৌলিক নিয়মটির পরিবর্তন ঘটাতে হলো প্রায় চল্লিশ বছর পর। ইংরেজ পদার্থবিদ মোসলে দেখালেন যে, পারমাণবিক ওজনের পরিবর্তে পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী সাজালেই পর্যায় সারণিতে মৌলগুলির অবস্থান সঠিক হয়। পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে মৌলের নিউক্লিয়াসে যে প্রোটন থাকে তার সংখ্যা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব পর্যন্ত পরমাণু সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, পরমাণু একটি মৌলিক পদার্থের সূক্ষ্মতম কণিকা, এটি দেখতে একটি অতি সাধারণ নিরেট বিলিয়ার্ড বলের মতো এবং অবিভাজ্য। অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও পরমাণুর গঠন সম্পর্কে তখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা দৃঢ়ভাবে কোনো ধারণাই দিতে পারেন নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইলেকট্রন, প্রক্স-রশ্মি, তেজস্ক্রিয়তা প্রভৃতি কতকগুলো অসাধারণ আবিষ্কারের ফলে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে ধারণা করার সুযোগ পেলেন বিজ্ঞানীরা। অর্থাৎ পরমাণুকে যে রূপ নিরেট বিলিয়ার্ড বল ভাবা হয়েছিল, আসলে সেটি তা নয়। পরমাণুরও রয়েছে একটি নিজস্ব গঠন-বৈশিষ্ট্য এবং এই গঠন বেশ জটিল।

বিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো গ্যাস বিদ্যুৎ পরিবহন করে না, কিন্তু বৈদ্যুতিক চাপ যদি অত্যধিক করা সম্ভব হয়—তাহলে গ্যাসের অপরিবাহিতা ধর্ম নষ্ট হয়ে যায় এবং স্ফুলিঙ্গ প্রবাহিত হয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই আবিষ্কৃত হয়েছিল ক্যাথোড-রশ্মি, ১৮৫৯ সালের দিকে। ক্যাথোড-রশ্মি উৎসারিত হয় ক্যাথোড থেকে এবং টিউবের কাচের গায়ে যেখানে এই রশ্মি আঘাত করে সেখানে সবুজ প্রতিপ্রভার সৃষ্টি হয়।

১৮৮৪ সালে মাত্র ২৮ বছর বয়সে ক্যাভেন্ডিশ প্রফেসর হিসেবে কেমব্রিজের বিখ্যাত ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে যোগদানের পর জোসেফ জন থমসন ক্যাথোড-রশ্মি নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। ক্যাথোড-রশ্মি আবিষ্কারের পর প্রায় অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এই রশ্মির প্রকৃতি সম্পর্কে তখনো সুস্পষ্ট ধারণা বিজ্ঞানীরা পান নি। স্যার উইলিয়াম ক্রুকস কর্তৃক ক্যাথোড-রশ্মি আবিষ্কারের পর মোটামুটি এ ধারণাই গড়ে উঠেছিল যে, ক্যাথোড-রশ্মি আসলে নেগেটিভ চার্জযুক্ত কণার প্রবাহ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। স্যার থমসন একটি চুম্বকের সাহায্যে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এই কণাগুলোকে তাদের নিজস্ব গতিপথ থেকে বাকাতে সক্ষম হন। এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে তিনি একটি কণাকে কতটুকু বাকাতে কতটুকু চৌম্বক বলের প্রয়োজন হয় তা নির্ণয় করতেও সমর্থ হন এবং এই তথ্য থেকে কণাগুলোর ওজন ও চার্জ বের করেন। দেখা গেল—কণাগুলোর প্রত্যেকটির ওজন একটি হাইড্রোজেন

দেখার জন্য তিনি পুরু কাগজ দিয়ে ইউরেনিয়ামের একটি টুকরো আবার মুড়ে রাখলেন। দেখা গেল, টুকরোটি থেকে এক ধরনের রশ্মির বিকিরণ ঘটছে। বেকেরেল ব্যাপারটি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ইউরেনিয়াম আছে এমন সব পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন তিনি। দেখলেন এ ধরনের সব পদার্থই স্বতঃস্ফূর্তভাবে রশ্মি বিকিরণ করে। বেকেরেল মনে করলেন, এই স্বতঃস্ফূর্ত রশ্মি সম্ভবত এক-রে বা সে ধরনের কোনো রশ্মি।

রহস্যটি উদ্ঘাটনের কাজে এগিয়ে এলেন অন্য বিজ্ঞানীরাও। এঁদের মধ্যে ছিলেন মেরী ও পিয়েরে কুরী। তাঁরা দেখতে পেলেন, থোরিয়াম নামক পদার্থটিও ইউরেনিয়ামের মতোই স্বতঃস্ফূর্তভাবে রশ্মি বিকিরণ করে। এভাবে বিভিন্ন আকরিক নিয়ে পরীক্ষা করে নতুন দুটি পদার্থ খুঁজে পেলেন তাঁরা। এ দুটির নাম রাখা হলো পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম। এদিকে অপর কয়েকজন বিজ্ঞানীও এ ধরনের রশ্মি-বিকিরণকারী কয়েকটি পদার্থ খুঁজে পেলেন। এতদিন পর্যন্ত এই বিকিরণের নাম ছিল আবিষ্কারক বিজ্ঞানীর নামানুসারে 'বেকেরেল-রশ্মি'। এবার প্রক্রিয়াটির নতুন নাম হলো রেডিওয়াক্টিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা। পিয়েরে কুরী ও মেরী কুরী উভয়েই গণ্য করলেন যে, সব ধরনের মৌলিক পদার্থ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রশ্মি বিকিরণ করে না, কেবল অল্প কয়েকটি মৌলিক পদার্থই তা করে। তাঁরা ধারণা করলেন, এইসব মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মধ্যেই তেজস্ক্রিয়তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে।

ফ্রান্সে বেকেরেল এবং জার্মানিতে মেয়ার সুইডলার ও গাইসেল একই সময়ে লক্ষ করলেন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে রশ্মি নির্গত হয় সেই সব রশ্মিকে একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে ক্যাথোড-রশ্মির মতোই তাদের পথ থেকে হেলিয়ে দেওয়া যায়। এ থেকে তাঁরা ধারণা করলেন যে, এই রশ্মিগুলোও নিশ্চয়ই ক্যাথোড-রশ্মির মতো নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট।

এ সময়ে কেমব্রিজে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিয়ে কাজ করছিলেন প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। তিনি তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে খুব পাতলা একটি অ্যালুমিনিয়াম শীটের উপর ফেলে দেখতে পেলেন, রশ্মির একটি অংশ অ্যালুমিনিয়াম শীটের মধ্যে ০.০০২ সেন্টিমিটারের বেশি যেতে পারে নি। রাদারফোর্ড এদের নাম দিলেন আলফা রশ্মি। তিনি আরও লক্ষ করেন যে, রশ্মির আর একটি অংশকে আটকে রাখার জন্যে মোটা অ্যালুমিনিয়াম শীট দরকার হয়। এই রশ্মিগুলোর তীব্রতা আলফা-রশ্মির চেয়ে প্রায় একশো গুণ বেশি। রাদারফোর্ড এদের নাম দেন বিটা-রশ্মি। এদিকে ১৯০০ সালে ফ্রান্সে ভিলার্ড নামে একজন বিজ্ঞানী তেজস্ক্রিয় রশ্মির আরও একটি অংশ আবিষ্কার করলেন। এই অংশটিকে চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা হেথানো সম্ভব হয় নি, অথচ এটির তীব্রতাই সবচেয়ে বেশি। তেজস্ক্রিয় রশ্মির এই অংশটিকেই বর্তমানে গামা-রশ্মি নামে অভিহিত করা হয়।

তেজস্ক্রিয় বস্তুর কোনোটি থেকে নির্গত হয় শুধু আলফা-রশ্মি, কোনোটি থেকে নির্গত হয় শুধু বিটা-রশ্মি। আবার কোনো কোনো তেজস্ক্রিয় বস্তু হতে আলফা, বিটা

গোলকের ব্যাসার্ধের সমান হবে। এভাবে থমসন পজিটিভ গোলকের মধ্যে ১ থেকে ১০০টি ইলেকট্রনের বিন্যাস ব্যাখ্যা করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, থমসনের পরমাণু-মডেলটি মোটেই সহজবোধ্য ছিল না। মনে হয়, জ্যামিতিক বিশ্বের ধরনটির কথাই হয়ত মনে ছিল তাঁর... যেমনটি করেছিলেন কোপার্নিকাস তাঁর সৌরজগতের মডেলটিতে। অতএব সর্বজনগ্রাহ্য হলো না সেটি। তাহলে পরমাণুর রূপটি কেমন হবে? খালি চোখে তো আর দেখা যায় না পরমাণু!

তেজস্ক্রিয়তার চাবিকাঠি

জার্মান বিজ্ঞানী রন্টগেন (Roentgen) এক্স-রে আবিষ্কার করেন ১৮৯৫ সালে। রন্টগেন সে সময় ক্রুক্স কাচনলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ক্যাথোড-রশ্মি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। তিনি লক্ষ করলেন, ক্যাথোড-রশ্মি ক্যাথোড প্রেট থেকে এসে অ্যানোড প্রেটে আঘাত করার পর অ্যানোড প্রেট থেকে কাচনলের কাচ ভেদ করে কিছু একটা বেরিয়ে আসছে এবং তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি দেখলেন, অ্যানোড প্রেট থেকে যে রশ্মি বেরিয়ে আসছে তা কাচ, কাগজ ইত্যাদি অনায়াসে ভেদ করে যেতে পারে। রন্টগেন বুঝলেন, অ্যানোড প্রেট থেকে বেরিয়ে আসা এই রশ্মি ক্যাথোড-রশ্মি বা ইলেকট্রন নয়, কারণ ইলেকট্রন কাচ বা কাগজ ভেদ করে যেতে পারে না। রন্টগেন বুঝতে পারলেন না রশ্মিটা আসলে কি। তাই তিনি এই অদৃশ্য রশ্মির নাম দিলেন ‘এক্স-রে’। এই রশ্মিকেই বাংলায় আমরা বলি রঞ্জন-রশ্মি, এর আবিষ্কারের নামের সাথে মিল রেখে। রঞ্জন-রশ্মির আবিষ্কার ছিল পরমাণু-বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে এক বিরাট বিপ্লব। এই আবিষ্কার পরমাণু-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে খুলে দেয় সম্ভাবনার নতুন এক জগৎ।

ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী অঁরি বেকেরেল ১৮৯৬ সালের গোড়ার দিকে কয়েকটি অনুপ্রভ বা ‘ফসফরোসেন্ট’ পদার্থ নিয়ে কাজ করছিলেন। একদিন কাজের পর বাড়ি চলে যাওয়ার আগে বেকেরেল তাঁর গবেষণাগারের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। তিনি আলমারিতে তুলে রাখলেন টেস্ট-টিউব আর ফ্লাস্কগুলো। তাকে রাখলেন কালো কাগজ দিয়ে মোড়া ফোটোগ্রাফিক প্রেট। আবারও ঝকঝকে তকতকে টেবিলগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। লক্ষ করলেন, একটি বস্তুর কয়েকটি টুকরো পড়ে আছে এক জায়গায়। বেকেরেল ওই বস্তুটির ধর্ম নিয়ে গবেষণা করছিলেন। বস্তুটির নাম ছিল ইউরেনিয়াম। বেকেরেলের খুব তাড়া ছিল। তিনি টুকরোগুলো তুলে তাকের দিকে ছুঁড়ে ফেললেন। একটি টুকরো ফোটোগ্রাফিক প্রেটের প্যাকেটে গিয়ে পড়ল। বেকেরেল আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন।

পরদিন বেকেরেল প্যাকেটের উপর থেকে টুকরোটি ফেলে দিয়ে প্রেটে প্রয়োজনীয় ফোটো তুললেন। তারপর ডেভেলাপ বা পরিস্ফুটন করতে গিয়ে দেখলেন ফোটোগ্রাফিক প্রেটটি নষ্ট হয়ে গেছে। ইউরেনিয়ামের টুকরোটি যেখানে ছিল সেখানে কালো একটি দাগ দেখা যাচ্ছিল। বেকেরেল অবাক হয়ে গেলেন। ব্যাপারটি কি তা

পরমাণুর আয়তন। অতএব পরমাণুর ভেতরে অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা এবং পরমাণুর আয়তনের তুলনায় নিউক্লিয়াস অতি ক্ষুদ্র স্থানই দখল করে রয়েছে। এর আয়তন পরমাণুর মোট আয়তনের এক হাজার লক্ষ কোটি ভাগের একভাগ মাত্র। তবুও পরমাণুর মোট পদার্থের প্রায় সবটুকু রয়েছে এই নিউক্লিয়াসে।

বোর-এর পরমাণু-মডেল

রাদারফোর্ডের পরমাণু-মডেলটি পরমাণুর একটি প্রায়-পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরলেও প্রশ্ন উঠল এই মডেলটির সাহায্যে পরমাণু-বর্ণালির ব্যাখ্যা নিয়ে। তড়িৎ-চৌম্বক তত্ত্ব অনুসারে, বৈদ্যুতিক চার্জবিশিষ্ট চলমান কণিকা থেকে শক্তি বিকীর্ণ হয়। সুতরাং, রাদারফোর্ডের পরমাণু-মডেল অনুসারে নিউক্লিয়াসের চারপাশের ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনেরও অবিরাম শক্তি বিকিরণ করা উচিত। এইভাবে শক্তি বিকিরণ করে পরমাণু-শক্তির অপচয়ের ফলে ইলেকট্রন একটি সর্পিল পথে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমবর্ধমান অবিচ্ছিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির আলোক বিকিরণ করে পরিশেষে নিউক্লিয়াসের মধ্যে এসে পড়বে। এতে পরমাণুর স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবে। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির পরমাণু-বর্ণালি কোনো পরীক্ষাতেই পাওয়া গেল না। পরমাণুকে কেবল নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সির বিচ্ছিন্ন বর্ণালি-রেখা নির্গমন করতেই দেখা যায়। অতএব, রাদারফোর্ডের পরমাণু-মডেল অসম্পূর্ণ, নতুবা তড়িৎ-চৌম্বক তত্ত্ব পরমাণুর এই বিচ্ছিন্ন বর্ণালী-রেখার উৎস ব্যাখ্যা করতে অক্ষম।

রাদারফোর্ডের পরমাণু-মডেলটির এই অনিবার্য বিপর্যয় রোধ করতে এগিয়ে এলেন ডেনমার্কের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী নীলস্ বোর। কোপেনহাগেন-এর এই বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানী ছিলেন তখন পদার্থবিজ্ঞানী সমাজের মধ্যমণি। বোর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রয়োগ করে রাদারফোর্ডের পরমাণু-মডেলটির সুন্দর একটি ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। তিনি দুটি স্বতঃসিদ্ধ উপস্থাপিত করলেন তাঁর তত্ত্বে। প্রথম স্বতঃসিদ্ধটি হলো : পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো কক্ষপথে আবর্তন করতে পারে না। ইলেকট্রনগুলো কেবল এমন নির্দিষ্ট কক্ষপথেই আবর্তন করবে যাতে তাদের কৌণিক ভরবেগ সবসময় $h/2\pi$ এর $|h|$ = প্লাঙ্কের ধ্রুবক। অথও গুণিতক হয়। দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ হলো, যখন কোনো ইলেকট্রন একটি উচ্চতর বা



বহিঃস্থ অনুমোদিত কক্ষপথ থেকে লাফ দিয়ে একটি নিম্নতর বা অভ্যন্তরীণ কক্ষপথে এসে পড়বে, তখনই কেবল শক্তি বিকিরণ ঘটবে। বোর-এর স্বতঃসিদ্ধ প্রয়োগের ফলে রাদারফোর্ডের পরমাণু-মডেলটির বর্ণালি-রেখা সমস্যার একটি সমাধান পাওয়া গেল। বোর তাঁর

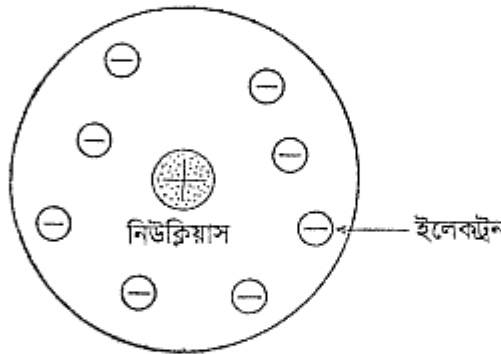
চিত্র ৩ : অক্ষের চারপাশে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন

একটি সমাধান পাওয়া গেল। বোর তাঁর

উভয় রশ্মিই নির্গত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলফা বা বিটা-রশ্মি বেরোনোর সময় গামা-রশ্মিও বেরিয়ে আসে। এছাড়া কোনো কোনো তেজস্ক্রিয় বস্তু হতে, যেমন রেডিয়াম, আলফা, বিটা, গামা—তিনটি রশ্মিই নির্গত হয়। তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলোর উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, আলফা-রশ্মি পজিটিভ চার্জবাহী ভারী কণার সমষ্টি, বিটা-রশ্মি নেগেটিভ চার্জবাহী হালকা কণার সমষ্টি আর গামারশ্মি চার্জনিরপেক্ষ।

রাদারফোর্ডের পরমাণু-মডেল

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে রাদারফোর্ড ‘আলফা-কণিকা বিক্ষেপণ’ পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর দেখলেন যে, এই পরীক্ষার ফলাফল থমসনের পরমাণু-মডেলকে সমর্থন করে না। তিনি বললেন, পরমাণুর সমস্ত পজিটিভ চার্জ পরমাণুর কেন্দ্রে অতি অল্প স্থানের মধ্যে



চিত্র ২ : রাদারফোর্ডের পরমাণু-মডেল

কেন্দ্রীভূত থাকে ধরে নিলেই তাঁর পরীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যা করা যায়। অতএব পরমাণুর নতুন মডেল উপস্থাপন করলেন তিনি। তাঁর মডেল অনুসারে—পরমাণু-কেন্দ্রেই পরমাণুর সমস্ত পজিটিভ চার্জ কেন্দ্রীভূত এবং নেগেটিভ চার্জবাহী ইলেকট্রনগুলো কুয়াশায় আবৃত। পরমাণুতে পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জের পরিমাণ সমান। রাদারফোর্ড পরমাণুর পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট কেন্দ্রটিকে ‘নিউক্লিয়াস’ নামে অভিহিত করলেন।

রাদারফোর্ডের পরমাণু-মডেলটি থমসনের মডেল থেকে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হলেও এতে কয়েকটি সমস্যা কিন্তু থেকেই যায়। প্রধান সমস্যা দেখা দেয় পরমাণুর স্থিতিশীলতা নিয়ে। এই সমস্যা নিরসনের জন্য রাদারফোর্ড মডেলটি কিছুটা সংশোধন করে প্রস্তাব করলেন যে, নিউক্লিয়াসের চারদিকে স্থির অবস্থায় না থেকে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে এর চারদিকে অনবরত বৃত্তাকার পথে ঘুরে চলেছে। রাদারফোর্ডের এই মডেলটির সঙ্গে সৌরজগতের বেশ কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। এই মডেলটি থেকে যে সত্যটি বেরিয়ে এলো তা হচ্ছে, গহণুলোর মতো দূর দিয়ে নিউক্লিয়াসের চারপাশে যে সমস্ত ইলেকট্রন ঘুরছে তাদের কক্ষপথের আয়তনই

নিউক্লিয়াস এ-ধরনের পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট 'প্রোটন' কণা সমবায়েই গঠিত। কিন্তু কেবল 'প্রোটন' দ্বারা নিউক্লিয়াস গঠিত ধরে নিলে একটি বিশেষ ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়। যেমন, পর্যায়-সারণির প্রথম মৌলিক পদার্থ হলো হাইড্রোজেন, যার পারমাণবিক সংখ্যা এক। কাজেই এর পরমাণুতে আছে একটি ইলেকট্রন এবং একটি প্রোটন। প্রোটনের ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর পারমাণবিক ওজনের সমান। অতএব পারমাণবিক ওজনের বিষয়টি বিবেচনা করলে হাইড্রোজেন পরমাণু নিয়ে তেমন কোনো সমস্যাই থাকে না। কিন্তু জটিলতা দেখা গেল পর্যায়-সারণিতে অন্তর্ভুক্ত এর পরের মৌলিক পদার্থগুলোকে নিয়ে। হাইড্রোজেনের পরের মৌলিক পদার্থ হলো হিলিয়াম, যার পারমাণবিক সংখ্যা দুই। কাজেই এর পরমাণুতে আছে দুটি ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসে দুটি প্রোটন। দুটি প্রোটনের পারমাণবিক ওজন হচ্ছে দুই। অথচ হিলিয়ামের পারমাণবিক ওজন হচ্ছে চার। প্রশ্ন দেখা দিল, অতিরিক্ত দুই ওজন আসবে কোথেকে! বলা বাহুল্য, পর্যায়-সারণির পরবর্তী মৌলিক পদার্থগুলোর ক্ষেত্রেও এমনি প্রশ্ন ছিল প্রযোজ্য। ১৯১২ সাল থেকে পরবর্তী প্রায় বিশ বছর এ সমস্যার কোনো সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নি। ফলে ধারণা করা হলো যে, একটা মৌলিক পদার্থের যে পারমাণবিক ওজন, হয়তো তার নিউক্লিয়াসে ততগুলো প্রোটনই আছে, এবং পারমাণবিক সংখ্যা অনুসারে নিউক্লিয়াসে যে-সংখ্যক পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট প্রোটন—থাকা উচিত তার অতিরিক্ত প্রোটনগুলোকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য সমসংখ্যক ইলেকট্রন আছে নিউক্লিয়াসেই। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত নিউক্লিয়াস সম্পর্কে এই ধারণাটি প্রোটন-ইলেকট্রন তত্ত্ব নামে পরিচিত ছিল বিজ্ঞানীদের মধ্যে।

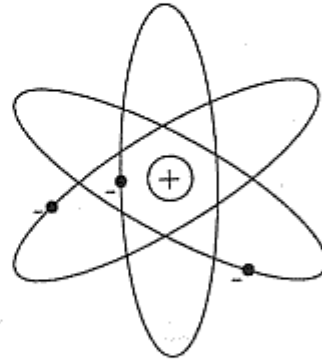
১৯৩০ সালে হানস বেথে এবং বেকার জার্মানি থেকে জানালেন, কোনো কোনো হালকা মৌলিক পদার্থ, বিশেষ করে বেরিলিয়ামকে, পোলোনিয়াম থেকে নির্গত আলফা-কণা দ্বারা আঘাত করলে একপ্রকার অত্যন্ত তীব্র রশ্মি নির্গত হয়। তাঁরা মনে করেছিলেন, এই রশ্মিগুলো হয়তো কোনো প্রকার উচ্চশক্তিসম্পন্ন গামা-রশ্মি হবে। ১৯৩২ সালে ফ্রান্সে ফ্রেডারিক জুলিও এবং তাঁর স্ত্রী আইরিন কুরী বেরিলিয়াম দিয়ে অনুরূপ পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে পেলেন, বেরিলিয়াম থেকে নির্গত রশ্মিগুলো পুরু সীসার বর্ম ভেদ করে যেতে পারে, অথচ অনুরূপ সীসা সাধারণত গামা-রশ্মি বিশোষণ করে নেয়। তাঁরা আরো লক্ষ্য করলেন, হাইড্রোজেন আছে এমন কোনো বস্তুর পাত, বিশেষ করে প্যারারফিন, যদি এই রশ্মির পথে রাখা হয় তবে সেখান থেকে প্রচণ্ড বেগে প্রোটন বেরিয়ে আসে।

একই সময়ে ইংল্যান্ডে জেমস চ্যাডউইক অনুরূপ পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, এই রশ্মিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে তাদের পথ থেকে হেলোনো যায় না এবং রশ্মিগুলোর গতি অত্যন্ত কম। অতএব তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, রশ্মিগুলোর কোনো চার্জ নেই এবং এগুলো গামা-রশ্মি বা রঞ্জন-রশ্মি কোনোটিই নয়। চ্যাডউইক এই রশ্মির কণাগুলির ওজনও বের করতে সক্ষম হন। দেখা গেল ওজন প্রোটনের সমান। তিনি কণাগুলোর নাম দিলেন নিউট্রন এবং রশ্মির নাম রাখা হলো নিউট্রন-রশ্মি।

মডেল প্রয়োগ করে বর্ণালি-রেখার ব্যাখ্যাও প্রদান করলেন। কিন্তু বিপদ এলো এবার অন্য দিক থেকে। সমস্যাটি হলো : যে সমস্ত বর্ণালি-রেখাকে এতদিন এক-একটি স্বতন্ত্র রেখা মনে করা হয়েছিল, উচ্চমাত্রার শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি দ্বারা দেখা গেল যে, সেগুলো একটি নয়, বরং বেশ কয়েকটি সূক্ষ্ম রেখার সমষ্টি। বোর-এর পরমাণু-মডেল অনুসরণে বর্ণালি-রেখার সূক্ষ্ম গঠন ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো না।

এবার, ১৯১৫ সালে জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী সোমারফেল্ড নতুন আর একটি পরমাণু-মডেলের প্রস্তাব করলেন। তাঁর মডেল ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন যে, ইলেকট্রনগুলো বৃত্তাকার পথে না ঘুরে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে এবং এর ফলে ইলেকট্রনের ভর, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী, এর গতিবেগের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী গতিবেগের পরিবর্তনের ফলে ইলেকট্রনের ভরেরও পরিবর্তন হয়। ইলেকট্রনের উপবৃত্তাকার কক্ষপথ মতবাদ প্রয়োগ করে সোমারফেল্ড বর্ণালি-রেখার সূক্ষ্ম গঠন সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

পরমাণুর গঠন-সম্পর্কিত এসব মডেল থেকে পরমাণুর যে চেহারাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল, তা হচ্ছে—পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসটিতেই কেন্দ্রীভূত রয়েছে পরমাণুর ভর। এই নিউক্লিয়াস পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট। আর নিউক্লিয়াসটির চারদিকে বিভিন্ন উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট ইলেকট্রন।



চিত্র ৪ : ইলেকট্রনের কক্ষপথ

নিউক্লিয়াসের গঠন

রাদারফোর্ডের নিউক্লিয়াস-তত্ত্ব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিউক্লিয়াসের গঠন ঘন ও নিবিড়। একটি পরমাণুর মোট আয়তনের এক হাজার লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ স্থান মাত্র দখল করে আছে নিউক্লিয়াস। কিন্তু নিউক্লিয়াসের গঠন কেমন? ১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড আলফা-কণা দিয়ে আঘাত করে নাইট্রোজেন পরমাণু ভেঙে অক্সিজেন পরমাণু উৎপন্ন করতে সক্ষম হন। তিনি দেখলেন নাইট্রোজেন পরমাণু ভেঙে যে কণাগুলো ছিটকে বেরিয়ে পড়ে সেগুলো পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট এবং তাদের প্রত্যেকটির ভরও সমান। রোরিন, সোডিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম নিয়ে একই পরীক্ষা চালালেন তিনি। ফল হলো একই রকম। রাদারফোর্ড পরমাণু থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়া পজিটিভ কণাগুলোর নাম রাখলেন 'প্রোটন'। তিনি ধারণা করলেন, পরমাণুর

করে। আমরা জানি, প্রোটনের ভরকে m_p ও নিউট্রনের ভরকে m_n দ্বারা চিহ্নিত করা হলে একটি নিউক্লিয়াসের ভর হওয়া উচিত

$$m'_N = Zm_p + (A-Z)m_n$$

কিন্তু ভর-বর্ণালিলেখ যন্ত্রের (mass spectrograph) মাধ্যমে নিউক্লিয়াসের ভর নির্ণয় করে দেখা গেছে, নির্ণীত ভর পূর্বোক্ত ভরের চেয়ে কম। অর্থাৎ নির্ণীত ভর m_N হলে,

$$m'_N > m_N$$

m'_N ও m_N -এর অন্তরকে নিউক্লিয়াসের ভর-ত্রুটি (mass defect) বলা হয়, ভর-ত্রুটি, $\Delta m = m'_N - m_N$

এই তথ্য থেকে বুঝা যায়, মুক্ত প্রোটন ও নিউট্রনগুলো একত্রিত হয়ে নিউক্লিয়াস গঠন করলে কিছু ভর অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ভরই হলো ভর-ত্রুটি। প্রকৃতপক্ষে এই ভরটুকু কোথাও হারিয়ে যায় না, নিউক্লিয়াস গঠনের সময় নিউক্লিয়াস গঠনকারী কণিকাগুলোর কিছুটা ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয় মাত্র। অতএব, নিউট্রন ও প্রোটনগুলোকে একত্রে বেঁধে নিউক্লিয়াসকে স্থায়ী ও দৃঢ়বন্ধ করার জন্য কিছুটা শক্তির আদান-প্রদান বা বিনিময় ঘটে থাকে। ইহাই নিউক্লিয়াসের বন্ধন-শক্তি। বণা বাহুণ্য, প্রতিটি ভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বন্ধন-শক্তি ভিন্ন, যেমন লিথিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বন্ধন-শক্তি (Binding Energy) ৩২ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট; আবার স্ট্রোন্টিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বন্ধন-শক্তি ৪৬৯ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট। বন্ধন-শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করে দেখা গেছে, মাঝারি ভরবিশিষ্ট নিউক্লিয়াসগুলোর বন্ধন-শক্তি সবচেয়ে বেশি; অর্থাৎ সে-সব নিউক্লিয়াসই তুলনামূলকভাবে বেশি সুস্থিত এবং দৃঢ়বন্ধ।

নিউক্লীয় বল

আমরা জানি, পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আছে দুই প্রকার কণিকা—প্রোটন ও নিউট্রন। প্রোটন পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট এবং নিউট্রন চার্জ-নিরপেক্ষ। পদার্থবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মানুসারে প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে কোনো-প্রকার বৈদ্যুতিক আকর্ষণ থাকতে পারে না। বরং ঘনসংবন্ধ পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট প্রোটনগুলোর মধ্যে বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ-বল বিদ্যমান থাকার কারণে তাদের পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া উচিত। অথচ প্রোটনগুলো তা না করে বরং নিউক্লিয়াসের মধ্যে খুব নিবিড়ভাবে অবস্থান করে এবং এদের বিচ্ছিন্ন করতে হলে বিপুল পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়। তাহলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন এক ধরনের বল রয়েছে, যা আমাদের অতি পরিচিত বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ-বল, অথবা মহাকর্ষ বলের চেয়ে ভিন্ন। এই বলটির নাম দেওয়া হলো নিউক্লীয় বল। বিজ্ঞানীরা ধারণা করলেন, এই নিউক্লীয় বলই প্রোটন ও নিউট্রনগুলোকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে একসাথে বেঁধে রেখেছে।

নিউট্রন আবিষ্কারের ফলে পরমাণুর গঠন-সম্পর্কিত সমস্যার অবসান ঘটল। পারমাণবিক গবেষণায় শুরু হলো নতুন এক অধ্যায়। নিউক্লিয়াসের প্রোটন-ইলেকট্রন তত্ত্বের পরিবর্তে এলো প্রোটন-নিউট্রন তত্ত্ব। প্রোটন-নিউট্রন তত্ত্ব অনুসারে, সমস্ত পরমাণুর নিউক্লিয়াস প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। নিউট্রন যেহেতু চার্জবিহীন কণা, অতএব হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে চারটি প্রোটন ও দুটি ইলেকট্রন না থেকে, কেবল দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন থাকলেই হলো। প্রোটন ও নিউট্রনের ভর প্রায় সমান বলে হিলিয়াম পরমাণুর ভরও ঠিক থাকবে এবং দুটি প্রোটনের পজিটিভ চার্জের বিপরীতে নিউক্লিয়াসের বাইরের দুটি ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জ থাকায় পরমাণুটিও চার্জবিহীন তথা তড়িৎ-নিরপেক্ষ হবে।

নিউক্লিয়াসের এই গঠনটিই বর্তমানে সর্ববাদীসম্মত গঠন বলে গৃহীত। পরমাণুর পারমাণবিক ভর তথা নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যা A দ্বারা নির্দেশ করা হয়, আর পারমাণবিক সংখ্যা তথা প্রোটন সংখ্যা নির্দেশ করা হয় Z দ্বারা। অতএব কোনো পরমাণুর A এবং Z জানা থাকলে সেই পরমাণুর নিউক্লিয়াসের নিউট্রন এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের সংখ্যা জানা মোটেই কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রে নিউট্রন-সংখ্যা হবে $(A - Z)$ এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যার সমান হবে।

নিউক্লিয়াসের আয়তন

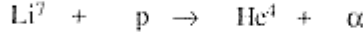
গাইগার ও মার্সডেনের আলফা-কণা বিক্ষেপণ পরীক্ষা থেকে রাদারফোর্ড ১৯১১ সালে নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করেন। তাঁর হিসাবে নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ হয় $১০^{-১২}$ সেন্টিমিটারের চাইতে কিছুটা কম। এরপর আরো অনেক বিজ্ঞানী নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিক্ষেপণ-পরীক্ষা সম্পাদন করেন। তাঁরা দেখতে পান যে, নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ এর ভরসংখ্যা A -এর সরাসরি সমানুপাতিক। পক্ষান্তরে একটি পরমাণুর ব্যাসার্ধ নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধের প্রায় $১০^৫$ গুণ। এ থেকে নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব পাওয়া যায় আর তা হচ্ছে প্রতি ঘন ইঞ্চিতে প্রায় $১০^{১০}$ টন। এই অসাধারণ ঘনত্ব সম্পর্কে ধারণা করা সত্যিই অসম্ভব। পরমাণুর মোট আয়তনের এক হাজার লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ স্থান মাত্র নিউক্লিয়াসের দখলে থাকে বলেই নিউক্লিয়াসের এই ঘনত্ব আমাদের জন্য সমস্যার কোনো কারণ হয়ে ওঠে নি। এর অন্যথা হলে কি ঘটতে পারত তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

নিউক্লিয়াসের বন্ধন-শক্তি

নিউক্লিয়াসে যদি শুধু প্রোটন থাকত তাহলে হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কোনো নিউক্লিয়াসই সুস্থিত বা স্থিতিশীল হতে পারত না; কারণ পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট প্রোটনগুলো নিশ্চয়ই একে অপরকে বিকর্ষণ করে তাড়িয়ে দিতে চাইত। এক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসে চার্জ-নিরপেক্ষ নিউট্রনের অবস্থান একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

অর্থাৎ আলফা-কণার সাথে নাইট্রোজেন-নিউক্লিয়াসের বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেন-নিউক্লিয়াস অক্সিজেনে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

১৯৩০ সালে ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জন ডগলাস ককরফট ও আর্নেস্ট টমাস এস. ওয়ালটন কৃত্রিম উপায়ে প্রোটনকে গতিশীল করে সেই প্রোটন দ্বারা লিথিয়ামকে আঘাত করেন। এই নিউক্লীয় বিক্রিয়ার ফলে লিথিয়াম হিলিয়ামে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অর্থাৎ



(লিথিয়াম) (প্রোটন) (হিলিয়াম) (আলফা-কণা)

এই নিউক্লীয় বিক্রিয়া ঘটানোর মধ্যে যে দিকটি ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হলো : এই বিক্রিয়া সংঘটিত করার জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বসে থাকতে হয় নি। এটিই ছিল কৃত্রিম উপায়ে পরমাণু ভাঙার প্রথম দৃষ্টান্ত। অতএব প্রাচীন আলকেমিস্টরা মৌলিক পদার্থের রূপান্তর সাধনের (সাধারণ পদার্থ থেকে সোনা তৈরি) যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিল বিশ শতকের ত্রিশের দশকের প্রারম্ভে। কিন্তু পরমাণুর রূপান্তর ঘটানোর এই প্রক্রিয়ায় কিছু অসুবিধাও ছিল। কারণ নিউক্লিয়াসের ব্যাস পরমাণুর ব্যাসের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ। কাজেই নিউক্লিয়াসের প্রস্থচ্ছেদ-ক্ষেত্র পরমাণুর প্রস্থচ্ছেদ-ক্ষেত্রের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ। এর অর্থ— একটি লিথিয়াম পরমাণুর ভেতর দিয়ে যাবার সময় একটি প্রোটনের লিথিয়াম নিউক্লিয়াসকে আঘাত করার সম্ভাবনা দশ কোটির মধ্যে একটি। আসলে সম্ভাবনা তারও কম। কারণ প্রোটন এবং লিথিয়াম নিউক্লিয়াস উভয়ই পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট বলে তারা একে অন্যকে দূরে ঠেলেও দিতে চায়।

নিউট্রনের ভূমিকা

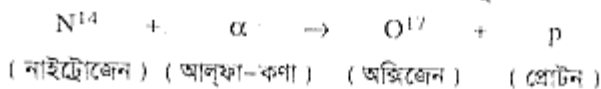
এই সমস্যার প্রথম ফলপ্রসূ সমাধান পাওয়া যায় ১৯২৩ সালে নিউট্রন আবিষ্কারের পর। নিউট্রন চার্জবিহীন কণা। অতএব যে কোনো পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে এর সংঘাত ঘটানোর সম্ভাবনাও বেশি। নিউট্রন আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীদের মধ্যে নিউট্রনকে ফেপনাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে পরমাণুর রূপান্তর ঘটানোর প্রয়াসের হিড়িক পড়ে যায়। তবে এ-কাজে সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করেন ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি। নিউট্রন ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সুবিধা ছিল এই যে, নিউট্রনকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বা দ্রুতগতিসম্পন্ন করার প্রয়োজন হয় না। বরং নিম্নগতিসম্পন্ন নিউট্রন নিউক্লীয় বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য আরো বেশি কার্যকর। কোনো নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় যখন নিউট্রন নির্গত হয়, তখন তাদের গতি বেশি থাকে। তাই পরবর্তী নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য গতি কমিয়ে নিউট্রনকে ধীরগতিসম্পন্ন করে নিতে হয়। নিউট্রনকে খনিজ মোম অথবা অধিক হাইড্রোজেন বা কার্বন বিশিষ্ট কোনো বস্তুর ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে নিউট্রনের গতি কমে যায়। এই জিনিসগুলোকে মন্ডরক বা

নিউক্লীয় বলের ধারণা এবং তা প্রমাণের ইতিহাস দীর্ঘ ও জটিল। শেষ পর্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রন দ্বারা প্রোটনকে আঘাত করে প্রোটনের দ্বারা বিভিন্ন গতিসম্পন্ন নিউট্রনের বিভিন্ন দিকে বিক্ষেপণের পরিমাণ থেকে নিউক্লীয় বলের প্রকৃতি নির্ণয় সম্ভব হয়। দেখা গেল—এই বল মহাকর্ষ বলের মতই আকর্ষণধর্মী, কিন্তু পুরোপুরি আকর্ষণধর্মী নয়। যেমন, এই বল সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণধর্মী হলে ভারী নিউক্লিয়াসগুলো অবশ্যই জমাটবদ্ধ নিষ্ক্রিয় কণিকায় পরিণত হতো এবং সমস্ত নিউক্লিয়াসের আয়তন সমান হয়ে যেত। কিন্তু বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, নিউক্লিয়াসের আয়তন এর ভরসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়। তাছাড়া প্রায় সকল নিউক্লিয়াসের প্রতিটি কণিকার জন্য বন্ধন-শক্তিও প্রায় কাছাকাছি। পরীক্ষায় দেখা গেছে—দূরত্ব যদি 0.3×10^{-10} সেন্টিমিটারের মধ্যে থাকে, তবে নিউক্লীয় বল তীব্র বিকর্ষণধর্মী হয়। এর অধিক দূরত্বে তা আকর্ষণধর্মী। আরো দেখা গেছে—যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে মাত্র কয়েকটি কণা আছে, সেই নিউক্লিয়াসে প্রতিটি কণাই প্রতিটি কণাকে আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু নিউক্লিয়াসের আকার একটু বড় হলেই তা আর সম্ভব হয় না। তখন একটি কণার আকর্ষণ কেবল তার নিকটবর্তী কয়েকটি কণার উপরই কার্যকর হয়। বাস্তবে নিউক্লীয় বল 2×10^{-10} সেন্টিমিটার দূরত্ব পর্যন্ত কার্যকর। অর্থাৎ নিউক্লীয় বিকর্ষণ-অঞ্চলটির চেয়ে নিউক্লীয় আকর্ষণ-অঞ্চলের বিস্তার ছ'-সাত গুণ বেশি।

আমাদের মনে রাখতে হবে—বহুসংখ্যক প্রোটনের ঘনিষ্ঠ উপস্থিতির জন্য প্রোটনগুলোর মধ্যে যে পারস্পরিক বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ থাকে উচিত, তা কিন্তু সব ক্ষেত্রেই রয়েছে। কিন্তু মূলত নিউক্লীয় বলের আকর্ষণী প্রভাবের কারণেই পরমাণুর নিউক্লিয়াস সাধারণত অটুট থাকে। খুব বড় আকারের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সংখ্যাও খুব বেশি। ফলে বৈদ্যুতিক আকর্ষণী বল এসব নিউক্লিয়াসে প্রবলতর। অথচ বড় আকারের নিউক্লিয়াসে নিউক্লীয় বল প্রবল হতে পারে না। এর ফলে খুব বড় পরমাণুর নিউক্লিয়াস তুলনামূলকভাবে কম দৃঢ় বা সুস্থিত হয় এবং এই ধরনের নিউক্লিয়াস তুলনামূলকভাবে অল্প আঘাতেই ভেঙে যায়।

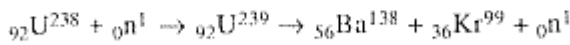
নিউক্লীয় বিক্রিয়া

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, রাবারফোর্ড ১৯১৯ সালে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত শক্তিশালী আলফা-কণা দ্বারা নাইট্রোজেনকে আঘাত করে অক্সিজেন উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরমাণু বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটিই ছিল মনুষ্যসৃষ্ট প্রথম নিউক্লীয় বিক্রিয়া। এই নিউক্লীয় বিক্রিয়ার সমীকরণটি নিম্নরূপ :



পদার্থ বলেই প্রমাণিত হলো। দেখা গেল, বস্তুটির রাসায়নিক ধর্মাবলি ঠিক বেরিয়ামের মতো। এ ঘটনায় বিস্মিত হান যখন ব্যাপারটির ব্যাখ্যা খুঁজছিলেন তখন ফ্রিশ এবং লিজে মাইটনার এর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন : এটা নতুন ধরনের একটি ঘটনা। নিউট্রনের আঘাতে এ ক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস দুটি তুলনীয় আকারের টুকরোয় ভেঙে গিয়েছে। এ ঘটনার কি নাম দেওয়া যেতে পারে ঠিক করতে না পেরে ফ্রিশ মার্কিন জীববিজ্ঞানী আর্নল্ডকে ঘটনাটির কথা বললেন। আর্নল্ড জীববিজ্ঞানে জীবকোষ বিভাজনের এ-ধরনের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বললেন, এ ঘটনাকেও জীববিজ্ঞানের মতো ‘ফিশন’ বলা যেতে পারে।

অটো হান-এর পরীক্ষায় যে বিভাজনটি ঘটেছিল তার বিক্রিয়া নিম্নরূপ :



অর্থাৎ ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে পাওয়া গেল বেরিয়াম এবং ক্রিপটন। সেই সঙ্গে বেরিয়ে এলো নিউট্রনও।

আমরা জানি, ইউরেনিয়াম-২৩৮ এর নিউক্লিয়াসে আছে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি নিউট্রন। আর বেরিয়ামের নিউক্লিয়াসে আছে ৫৬টি প্রোটন ও ৮২টি নিউট্রন। পর্যায়-সারণিতে বেরিয়ামের স্থান ইউরেনিয়াম থেকে অনেক দূরে। বেরিয়ামের ৫৬টি প্রোটন বাদ দিলে ৩৬টি প্রোটন থাকে। এই প্রোটন-সংখ্যা ক্রিপটনের সঙ্গে মিলে যায়। তবে ফিশন বা বিভাজন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বেরিয়াম ও ক্রিপটনের ভর-সংখ্যা স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বেরিয়াম ও ক্রিপটনের ভরসংখ্যা থেকে ভিন্ন। এ কারণে এই বেরিয়াম ও ক্রিপটন তেজস্ক্রিয় হয়ে থাকে।

তেজস্ক্রিয়তার কারণে নিউক্লিয়াস ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারটি বিজ্ঞানীদের কাছে নতুন কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু ‘বিভাজন’-এর ঘটনাটি এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। কারণ, এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রি তুলনীয় আকারের একাধিক খণ্ডে ভাঙে।

হান ও স্ট্রাসমান যখন এই নিউক্লীয় বিক্রিয়া ঘটিয়েছিলেন তখন লিজে মাইটনার কাজ করছিলেন স্টকহল্মে ইনস্টিটিউট অব সুইডিশ একাডেমি অব সাইন্সেজ-এ। অধ্যাপিকা লিজে মাইটনার জার্মানিতে নাৎসী শাসন কালে হওয়ার পর জার্মানি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। নিউক্লীয় বিক্রিয়ার মাধ্যমে বেরিয়াম উৎপাদনের কথা জানতে পেরে তিনি অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। মাইটনার এ ঘটনার প্রকৃত চিত্র নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে একটি ধারণায় উপনীত হলেন। তিনি বললেন, ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসটি প্রথমে একটি নিউট্রন বিশোধণ করে নেয় এবং এরপর সমান দুটি খণ্ডে ভাগ হয়ে গিয়ে দুটি মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি করে। উপরের নিউক্লীয় সমীকরণে মাইটনারের এই ভাবনাই চিত্রিত হয়েছে।

মডারেটর (moderator) বলা হয়। উপরিউক্ত ধীরগতি বলতে বুঝায় বাতাসের অণু সাধারণ অবস্থায় যে গতিতে চলে মোটামুটি সেই রকম গতি অর্থাৎ সেকেন্ডে প্রায় দু'কিলোমিটার।

ইউরেনিয়াম বিভাজন

ফার্মি ও তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীরা এবং তাঁদের সমসাময়িক আরো অনেক বিজ্ঞানী ১৯৩০-এর দশকের শুরু থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিউট্রন দিয়ে অনেক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। পর্যায়-সারণির বহু ভারী ও হালকা পদার্থকে তাঁরা ধীরগতিসম্পন্ন নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে দেখেছেন কি হয়। এভাবে বহু নতুন নতুন আইসোটোপ তাঁরা তৈরি করতে সমর্থ হন। আইসোটোপ বলতে আমরা বুঝি একটি মৌলিক পদার্থের হুবহু অনুরূপ রাসায়নিক ধর্মবিশিষ্ট মৌলিক পদার্থ, যার পারমাণবিক ওজন বা ভরই কেবল মূল পদার্থটি থেকে ভিন্ন। মূলত পরমাণুর নিউক্লিয়াসের নিউট্রন সংখ্যার হাসবৃদ্ধির ফলেই আইসোটোপের সৃষ্টি হয়।

১৯৩৪ সালের পর থেকেই ফার্মি এবং তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়ামের চাইতে ভারী পরমাণু তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন। ইউরেনিয়াম সবচেয়ে ভারী প্রাকৃতিক মৌলিক পদার্থ। এবং এটিই ছিল সে সময়ে পর্যায়-সারণির সর্বশেষ মৌলিক পদার্থ। ফার্মি ভেবেছিলেন, ধীরগতিসম্পন্ন নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়ামকে আঘাত করলে নিউট্রনটি ইউরেনিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। তারপর কোনো পারমাণবিক কণা সেখান থেকে বেরিয়ে গেলে ইউরেনিয়ামের চাইতেও ভারী কোনো মৌলিক পদার্থ তৈরি হতে পারে। ফার্মি নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়ামকে আঘাত করার অনেকগুলো পরীক্ষা চালান এবং মোট চার রকমের তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি করেন। এদের প্রত্যেকটিই বিটা-কণা (ইলেকট্রন) নিঃসরণ করতে থাকে। ফার্মি মনে করলেন— তিনি ঈঙ্গিত লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। কিন্তু ফার্মির নতুন পদার্থগুলো সম্পর্কে সবকিছু পুরোপুরি জানা গেল না। অতএব ফার্মির ধারণা সমর্থিত হলো না তেমন। ব্যাপারটি চাপাও পড়ল সেখানে।

ইতোমধ্যে ফ্রান্সে আইরিন কুরী, জার্মানিতে অটো হান ও স্ট্রাসমান এবং লিজে মাইটনারও চেষ্টা করেছিলেন ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারী মৌলিক পদার্থ তৈরি করার। অনেক নতুন পরমাণু তৈরি হলো, কিন্তু অত্যন্ত সল্প পরিমাণে তৈরি হওয়ার কারণে তাদের পরিচয় জানা সহজ হচ্ছিল না।

নিউক্লীয় বিভাজন (ফিশন)

১৯৩৮ সালে অটো হান নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়ামকে আঘাত করে এমন একটি তেজস্ক্রিয় বস্তু পেলেন যা অতি সহজে রাসায়নিক পরীক্ষায় যথেষ্ট হালকা একটি

আবার কখনো তিনটি। এই নবসৃষ্ট নিউট্রনগুলি আবার অন্যান্য $U-235$ নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে তাদের বিভাজিত করে। এভাবে আরও নিউট্রন উৎপাদিত হয় এবং বিভাজন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর $U-235$ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ এই ক্রমিক বিভাজনও অব্যাহত থাকবে। $U-235$ এর প্রতিটি বিভাজনে ২২০০ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্টের মতো শক্তি নির্গত হয়। অতএব এই ক্রমিক বিভাজন-প্রক্রিয়ার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তি প্রচণ্ড উত্তাপ আকারে নির্গত হয়।

তবে এ ধরনের শৃঙ্খল-বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য ইউরেনিয়াম খণ্ডটি একটি ন্যূনতম আকার ও আয়তনের হতে হয়। ইউরেনিয়াম খণ্ডের এই আকার ও আয়তনের জন্য ইউরেনিয়ামের যে পরিমাণ ভর থাকা উচিত তাকে বলে অতি ক্রান্তি-ভর (super critical mass)। এর কারণ হলো : বিভাজন ঘটানোর জন্য যে-সব নিউট্রন দ্বারা আঘাত করা হয় সেগুলো কোনো নির্দিষ্ট দিকে নিষ্ক্ষিপ্ত হয় না, ফলে $U-235$ পরমাণুর যে নিউক্লিয়াসের সঙ্গে নিউট্রনটির সংঘর্ষ ঘটবে সেটিতে পৌঁছার আগে নিউট্রনটিকে অন্য অনেক পরমাণু অতিক্রম করে যেতে হয় (পরমাণু-নিউক্লিয়াসের প্রস্থচ্ছেদের কথাটি এখানে আমাদের স্মরণ করা উচিত)। অতএব ইউরেনিয়াম খণ্ডটি বেশি ছোট হলে নবসৃষ্ট নিউট্রনগুলো কোনো শৃঙ্খল-বিক্রিয়া শুরুর আগেই ইউরেনিয়াম খণ্ডটি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এরূপ অবস্থায় শৃঙ্খল-বিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব হয় না।

পারমাণবিক চুল্লি

তাত্ত্বিক দিক থেকে ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লীয় বিক্রিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটলেও বস্তুত ১৯৪২ সালের পূর্বে সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল-বিক্রিয়া ঘটানো কিছু বিজ্ঞানীদের পক্ষে তেমন সহজ হয়ে ওঠে নি। এর অন্যতম কারণ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মানি ও ইতালিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদী নাসীদেবর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বহু বিজ্ঞানীকে তাঁদের প্রিয় গবেষণাগারগুলো ফেলে দেশত্যাগ করে আশ্রয় নিতে হয়েছিল আমেরিকা বা অন্য কোনো দেশে। ইতালীয় বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি ছিলেন এঁদেরই একজন। তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন আমেরিকায়। তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও উদ্যোগেই শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার উপযোগী প্রথম পারমাণবিক চুল্লিটি নির্মিত হয়েছিল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামের স্কোয়াশ কোর্টের নিচে। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে এটি চালু হয়। অবশ্য জিলাডের সহায়তায় ফার্মির সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রথম যে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক চুল্লি নির্মিত হয়েছিল ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তার গুণন-উৎপাদক (multiplication factor) পাওয়া গিয়েছিল ০.৮৭। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে ১০০টি নিউট্রন নিউক্লীয় বিভাজনের জন্য ব্যবহার করে, তা থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে পাওয়া গিয়েছিল মাত্র ৮৭টি নিউট্রন। এই

মাইটনারের এই ভাবনাটির মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল এবং পরমাণু-বিজ্ঞানীরা অল্পকালের মধ্যেই তা চিহ্নিত করতে সক্ষম হলেন। দেখা গেল, একটি ধীরগতি নিউট্রন (যার শক্তি মাত্র ০.০৩ ইলেকট্রন-ভোল্টের কাছাকাছি) দ্বারা একটি ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজনের ফলে যে পরিমাণ ওজন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আইনস্টাইনের সমীকরণ অনুসারে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট (200 MeV)। এর অর্থ বিভাজন যে পরিমাণ শক্তি দিয়ে শুরু হয়েছিল, নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় তার চাইতে কয়েক শত কোটি গুণ শক্তি মুক্ত হয়ে এলো। হিসাব করে দেখা গেল, প্রতিবার এক গ্রাম ইউরেনিয়াম বিভাজনের দরুন যে শক্তি নির্গত হয় তার পরিমাণ হবে ০.৯৬×১০^৩ কিলোগ্রাট বা প্রায় এক মেগাওয়াট।

কিন্তু একটি ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজনের ফলে সৃষ্ট শক্তিজনিত তাপ আমাদের বাস্তব কোনো চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়; অর্থাৎ একসঙ্গে বহু পরমাণুর বিভাজন ঘটাতে না পারলে এই আবিষ্কারের বাস্তব মূল্য সামান্যই। অবশ্য সমস্যাটির সমাধানও নিহিত ছিল অই বিভাজন সমীকরণেই। কারণ একবার ইউরেনিয়াম-নিউট্রন নিউক্লীয় বিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেলে অই বিক্রিয়া থেকেই নতুন করে নিউট্রনের সৃষ্টি হয় এবং এভাবে ইউরেনিয়াম বিভাজন অব্যাহত থাকবে। এরই নাম শৃঙ্খল-বিক্রিয়া বা চেইন রিয়াকশন (Chain reaction)।

শৃঙ্খল বিক্রিয়া

অটো হান-এর ইউরেনিয়াম বিভাজন বিক্রিয়ায় আমরা লক্ষ করেছি, ইউরেনিয়াম-২৩৮ কে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করার পর প্রথমে ইউরেনিয়াম-২৩৯ সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেটি ভেঙে গিয়ে একটি নিউট্রনসহ বেরিয়াম ও ক্রিপটন তৈরি হয়। এখানে আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের তিনটি আইসোটোপ রয়েছে। এগুলো হলো :

- (১) U—234 = ৯২টি প্রোটন এবং ১৪২টি নিউট্রন।
- (২) U—235 = ৯২টি প্রোটন এবং ১৪৩টি নিউট্রন।
- (৩) U—238 = ৯২টি প্রোটন এবং ১৪৬টি নিউট্রন।

প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে শতকরা ৯৯.৩ ভাগই U—238 আইসোটোপ এবং শতকরা ০.৭ ভাগ U—235 আইসোটোপ। U—234 আইসোটোপ খুব কম দেখা যায়, তাই এর পরিমাণ বিবেচনার বাইরেই রাখা হয়। এই তিনটি আইসোটোপের মধ্যে একমাত্র U—235-এর পরমাণুতেই সরাসরি বিভাজন ঘটানো সম্ভব হয়। একটি ধীরগতি নিউট্রন দ্বারা আঘাত করা হলে U—235 নিউক্লিয়াস সরাসরি দুটি ছোট ছোট নিউক্লিয়াসে, দুই অথবা তিনটি প্রোটনে এবং গামা-রশ্মিতে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রতিটি বিভাজন প্রক্রিয়ায় গড়ে ২.৫টি করে নিউট্রন নির্গত হয় অর্থাৎ কখনো দুটি,

১. চুল্লি-অভ্যন্তর (Reactor Core)

পারমাণবিক চুল্লির অভ্যন্তরে থাকে অল্প পরিমাণ জ্বালানি-পদার্থ (ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম)। ধীরগতি নিউট্রন এসে এতে আঘাত করে প্রথমে একটি নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটায়। অতঃপর নবসৃষ্ট নিউট্রনগুলো পার্শ্ববর্তী অন্য নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটায় এবং এভাবে ক্রমবর্ধমান বিক্রিয়া ঘটতে থাকে। নিউট্রনগুলোকে অভ্যন্তর হতে বের হবার সুযোগ না-দিলে যতক্ষণ অভ্যন্তরে জ্বালানি-পদার্থ থাকবে ততক্ষণ ক্রমিক বিভাজনও অব্যাহত থাকে। এ-সময় বিভাজিত খণ্ডগুলোর প্রচণ্ড গতির ফলে অভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণ তাপ সৃষ্টি হয়।

২. মন্থরক বা মডারেটর (Moderator)

ইউরেনিয়াম-২৩৫ নিউক্লিয়াসের প্রত্যেক বিভাজনে ২/৩টি করে নিউট্রন সৃষ্টি হয় এবং এগুলোই শৃঙ্খল-বিক্রিয়া ঘটায় এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এইসব নিউট্রন তীব্রগতি এবং চার্জনিরপেক্ষ বলে এরা যে কোনো আবরণ ভেদ করে বিভাজন-প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে।

তাছাড়া, U—235 বিভাজনের জন্য ধীরগতি নিউট্রন প্রয়োজন। অতএব নবজাত নিউট্রনগুলোকে বাইরে বেরিয়ে যেতে না দিয়ে ধীরগতি করতে পারলেই শৃঙ্খল-বিক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। এই কাজটি করার জন্যই মন্থরক বা মডারেটর প্রয়োজন। সাধারণত পানি, গ্রাফাইট, বেরিয়াম এবং ভারী পানি নামক এক প্রকার বিশেষ ধরনের পানি মন্থরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভারী পানি মন্থরক হিসেবে ব্যবহারে খরচ অত্যন্ত বেশি, তাই খুব কম তা ব্যবহার করা হয়। সাধারণত গ্রাফাইট দ্বারাই মন্থরক তৈরি করা হয়। গ্রাফাইট অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়া সাধারণ পানিও মন্থরক হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

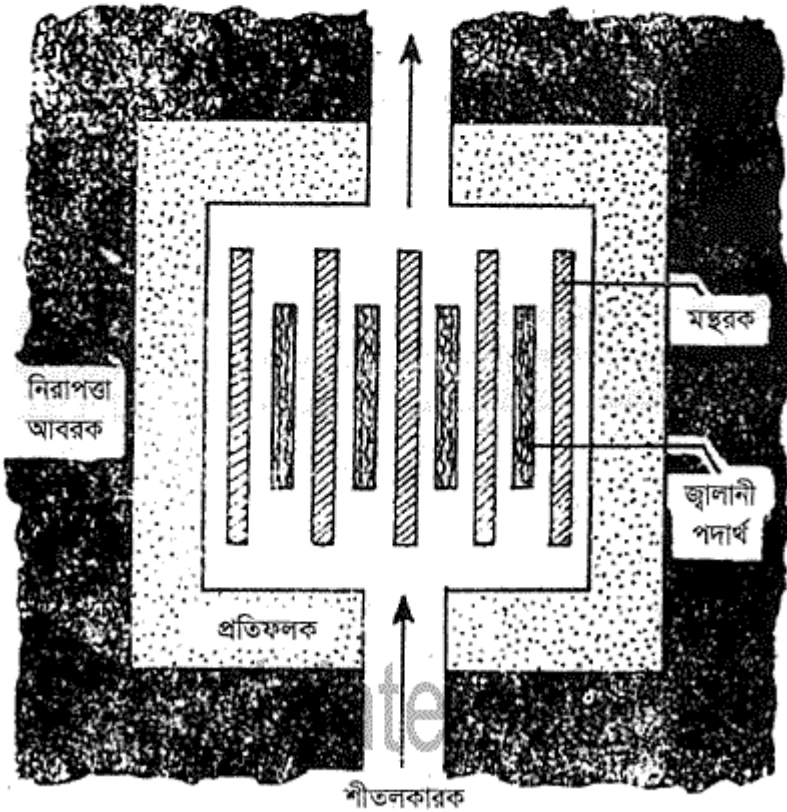
৩. নিয়ন্ত্রক দণ্ড (Control Rod)

পারমাণবিক চুল্লির অভ্যন্তরে নিউক্লীয় বিভাজন হার যদি অত্যধিক হয়, তাহলে বিভাজন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলতে থাকবে এবং এর ফলে অতিরিক্ত উত্তাপের সৃষ্টি হয়ে চুল্লিটির কর্মকাণ্ড আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিস্ফোরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। পরমাণু-বোমা আসলে এ ধরনেরই নিয়ন্ত্রণাভীত বিভাজন। তাই পারমাণবিক চুল্লিতে বিভাজন আয়ত্তাধীন রাখার জন্য ক্যাডমিয়াম অথবা বোরনের তৈরি কতকগুলি দণ্ড চুল্লির মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে সাজিয়ে রাখা হয়। এসব দণ্ডের কাজ হচ্ছে নিউট্রন কণা শোষণ করা।

পরিমাণ দ্বারা শৃঙ্খল-বিক্রিয়া আপনা থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। তাঁরা তাঁদের চুল্লির নকশা বদলালেন এবং চুল্লিতে ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম অক্সাইড ও গ্রাফাইটকে আরো বিশুদ্ধ করলেন। ১৯৪২ সালের মে মাসে গুণন-উৎপাদক দাঁড়াল ০.৯৮। এবার চলল চুল্লির নকশা পরিবর্তন ও আকরিক বিশুদ্ধকরণের কাজ। জুলাই মাসে গুণন-উৎপাদক পাওয়া গেল ১.০৭। তাঁরা এবার নিশ্চিত হলেন যে, নিউক্লীয় বিভাজনের শৃঙ্খল-বিক্রিয়া আপনা থেকে অব্যাহত রাখার মতো পারমাণবিক চুল্লি নির্মাণ করা সম্ভব।

পারমাণবিক চুল্লির প্রধান অংশসমূহ

পারমাণবিক চুল্লির গঠনপ্রণালী বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে এর ছয়টি প্রধান অংশ হচ্ছে : (১) চুল্লি-অভ্যন্তর, (২) মন্ডারক বা মডারেটর, (৩) নিয়ন্ত্রক দণ্ড, (৪) শীতলক, (৫) নিরাপত্তা আবরণ এবং (৬) প্রতিফলক।



চিত্র ৫ : পারমাণবিক চুল্লি

উত্তাপ গ্রহণ করে বাষ্প অথবা অন্য কোনো ব্যবহারযোগ্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়। প্রথমদিককার চুল্লিতে শীতলক হিসেবে বায়ু ব্যবহৃত হতো। পরে ঠাণ্ডা পানির ব্যবহার শুরু হয়। এছাড়া সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের মিশ্রণজাত একটি মিশ্রিত পদার্থ এবং সংকুচিত কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসও শীতলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৫. নিরাপত্তা আবরণ (Shield)

চুল্লির অভ্যন্তরে নিউক্লীয় বিভাজন চলার সময় শক্তিশালী নিউট্রন ও গামা-রশ্মি নির্গত হতে থাকে। বিভিন্ন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও এ সময় মাঝে মাঝে দুই একটি নিউট্রন চুল্লি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এই নিউট্রন এবং গামা-রশ্মি মানবদেহের জন্য খুবই মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। এগুলো জীবন্ত জীবকোষ নষ্ট করে দেয়। তাই এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চুল্লির চারপাশ পুরু দেয়াল দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়। এই দেয়াল সাধারণত সাত ফুট চওড়া নিরেট কংক্রিট, এর কিছু কম পুরু লোহা বা সীসার সাহায্যে তৈরি করা হয়। দেয়ালটি বাইরে বেরিয়ে আসা নিউট্রন ও গামা-রশ্মি শোষণ করে নেয়। এর ফলে নিউট্রন ও গামা-রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। পারমাণবিক চুল্লির চারপাশের এই দেয়ালকেই বলে নিরাপত্তা আবরণ বা শীল্ড।

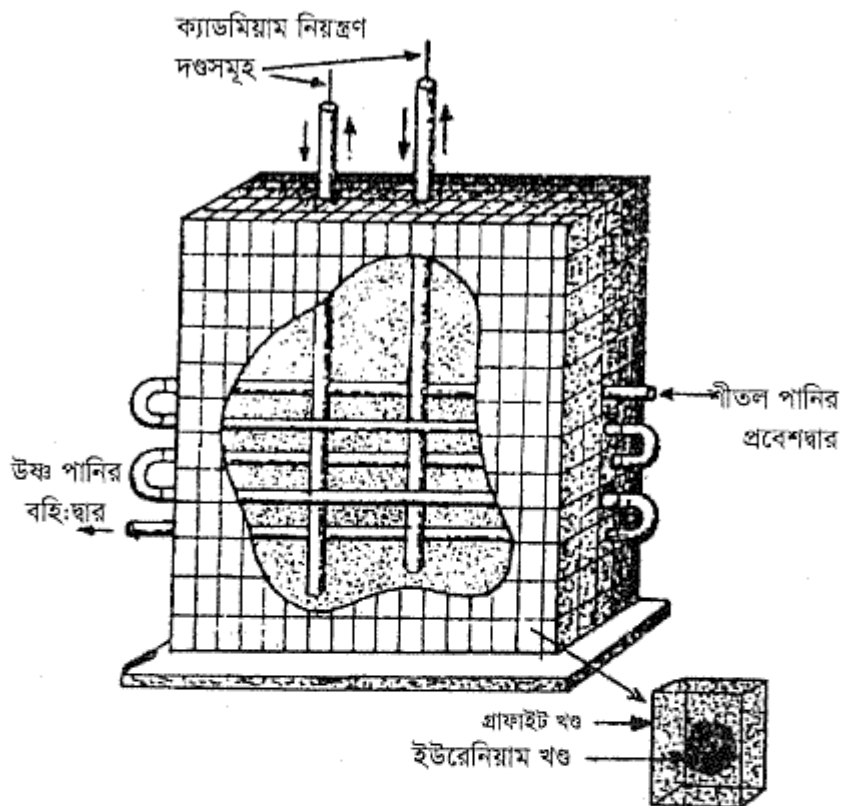
৬. প্রতিফলক (Reflector)

তীব্র গতিসম্পন্ন নিউট্রনগুলো মন্ডরকের সঙ্গে সংঘাত করে ধীরগতি হওয়ার সময় চুল্লির অভ্যন্তর হতে বেরিয়ে আসতে পারে। এটা যাতে সহজে না ঘটে সেজন্য অভ্যন্তরভাগের চারপাশ বেঙ্কন করে একটি প্রতিফলক থাকে। এই প্রতিফলক নিউট্রনগুলোকে আবার চুল্লির অভ্যন্তরে ফেরত পাঠায়।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

পারমাণবিক চুল্লির অন্যতম প্রধান ব্যবহার হলো এর সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন। পারমাণবিক চুল্লিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে কিভাবে ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে এবার আলোচনা করব আমরা। পারমাণবিক চুল্লিতে নিউক্লিয়াসের বিভাজনের ফলে যে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপশক্তি বাষ্প উৎপাদন-প্রকোষ্ঠে বাষ্প তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে স্টeam বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে অতঃপর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

পারমাণবিক চুল্লি হচ্ছে তলা ও চাকনিযুক্ত বিশাল এক ধাতব সিলিন্ডার। এটি দেখতে অনেকটা বড় ডেকচি বা বয়লারের মতো। চুল্লির অভ্যন্তরভাগে থাকে ইউরেনিয়ামের শলাকা এবং পানির পাইপ। শলাকাগুলোর মধ্যে নিউক্লিয়াসের বিভাজন



চিত্র ৬৪: পারমাণবিক চুল্লির নকশা

তাই এদের বলা হয় নিয়ন্ত্রক দণ্ড। এই দণ্ডগুলো এমনভাবে রাখার ব্যবস্থা থাকে যাতে প্রয়োজনমতো চুল্লির ভেতরে ঢুকানো যায় বা টেনে বের করা যায়। এসব দণ্ডের সাহায্যে পারমাণবিক চুল্লির নিউক্লীয় বিভাজন প্রয়োজন মত কমানো, বাড়ানো বা বন্ধ করা যায়। দণ্ডগুলো পরিচালিত হয় স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক উপায়ে।

৪. শীতলক (Coolant)

আমরা জানি, নিউক্লীয় বিভাজন প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ শক্তির উদ্ভব ঘটে। এতে তীব্র উত্তাপের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই উত্তাপ মাত্রাতিরিক্ত হলে চুল্লির অভ্যন্তরভাগ ফেটে যেতে পারে কিংবা অন্য কোনো ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে।

এজন্য পারমাণবিক চুল্লিতে একটি শীতলক ব্যবস্থা রাখা হয়। এর ফলে চুল্লির অভ্যন্তরভাগ ঠাণ্ডা থাকে এবং শীতলক পদার্থ চুল্লির অভ্যন্তর দিয়ে যাওয়ার সময় চুল্লির

কলুষিত পানিকে যদি বাষ্পে পরিণত করা হয় তাহলে পাইপ, পাম্প এবং টারবাইনও তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠবে। সেজন্যই পারমাণবিক চুল্লির তেজস্ক্রিয় পানি দিয়ে অন্য পানি গরম করা হয়। পাইপের দেয়ালগুলো ক্ষতিকর কণার প্রবাহ অনেকখানি কমিয়ে দেয়। এর ফলে দ্বিতীয় সার্কিটের পানি অতেজস্ক্রিয় বা প্রায় অতেজস্ক্রিয় থেকে যায়। অতএব টারবাইন এবং হিমায়কের চারপাশে জীবতাত্ত্বিক প্রতিরক্ষা গড়ার প্রয়োজন পড়ে না এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মীরা প্রায় নিরাপদেই কাজ করতে পারেন।

নিউক্লীয় বিভাজনের মাধ্যমে তাপ উৎপাদন করে সেই তাপকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় বলে এই পদ্ধতিকে থার্মোনিউক্লিয়ার প্রসেস (Thermo-nuclear process) বা তাপ-পারমাণবিক পদ্ধতি বলা হয়।

প্লুটোনিয়াম

আমরা আগেই বলেছি যে, প্রকৃতিতে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়, তার ৯৯.৩% ইউরেনিয়াম-২৩৮ এবং অবশিষ্ট ০.৭% ইউরেনিয়াম-২৩৫। ইউরেনিয়াম বিরল মৌলিক পদার্থ নামে অভিহিত, কারণ এটি প্রকৃতির খনিজভাণ্ডারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। তাই নিউক্লীয় বিভাজনের শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করাও একটি বড় রকমের সমস্যা। বস্তুত ১৯৪০ সালের দিকে যখন এর প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তখন পৃথিবীর সব দেশের ভাণ্ডার খোঁজ করেও মাত্র কয়েক গ্রামের বেশি বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম ধাতু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। অথচ রসায়নবিদগণের জরিপ মতে ভূপৃষ্ঠে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ পারদের আট গুণ, রূপোর চল্লিশ গুণ। আসলে তখনো ইউরেনিয়াম ধাতুর ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে সবাই তেমন সজাগ হয়ে ওঠে নি বলেই বিশুদ্ধ অবস্থায় এই ধাতু তেমন পাওয়া যেত না। তাছাড়া আকরিক থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের ব্যাপারটিও বেশ জটিল এবং ব্যয়বহুল।

ইউরেনিয়াম আবিষ্কৃত হয় ১৭৮৯ সালে। জার্মান রসায়নবিদ ক্লাপরথ পিচব্লেন্ড পাথরের মধ্যে এক নতুন মৌলিক পদার্থ আছে বলে প্রমাণ উপস্থিত করেন এবং মৌলিক পদার্থটির নাম দেন ইউরেনিয়াম। তিনি আকরিক থেকে ইউরেনিয়ামের বিশুদ্ধ যৌগ পদার্থ নিষ্কাশন করেছিলেন, কিন্তু মূল ধাতু বের করতে পারেন নি। এর প্রায় ৫০ বছর পর ফরাসি রসায়নবিদ পেলিগো মূল ধাতু নিষ্কাশন করার চেষ্টায় প্রথম সফল হন। ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের পদ্ধতি নিয়ে এরপর বিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে এসেছেন। এসব গবেষণার নানা পর্যায়ে বিভিন্ন সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তবুও ইউরেনিয়াম এখনো প্রচুরভাবে লভ্য নয় এবং সে কারণেই ইউরেনিয়াম অত্যন্ত মূল্যবান একটি ধাতু।

চলতে থাকে এবং এর ফলে সৃষ্ট উত্তাপে শীতলক পানি ভীষণ গরম হয়ে যায়। তখন পাম্পের সাহায্যে এই উত্তপ্ত পানি নিয়ে যাওয়া হয় বাষ্প উৎপাদন প্রকোষ্ঠে।

বাষ্প উৎপাদন প্রকোষ্ঠ বা স্টিম জেনারেটরের গঠন-পদ্ধতি মোটামুটি সরল। পাইপের মধ্যে পাইপ। ভেতরের পাইপ দিয়ে বয়ে যায় চুল্লি থেকে বেরুনো গরম পানি আর বাইরের পাইপ দিয়ে যায় ঠাণ্ডা পানি। ভেতরের পাইপের গরম পানির তাপে বাইরের পাইপের পানি গরম হয়ে ফুটতে শুরু করে এবং বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্প চাপ দেয় টারবাইনের ব্লেডগুলোতে। তখন ঘুরতে শুরু করে টারবাইন।

তাপ দেওয়ার পর চুল্লির পানি ঠাণ্ডা হয়ে আবার চুল্লিতে ফিরে যায়। আবার গরম হয় এবং আবার বাষ্প উৎপাদন প্রকোষ্ঠে ফিরে আসে। পানি প্রবাহের এই চক্রটিকে বলা হয় প্রথম সার্কিট।

অন্যদিকে টারবাইন ঘুরিয়ে বাষ্প চলে যায় রেফ্রিজারেটর বা হিমাযকে। সেখানে তা শীতল হয়ে পানিতে রূপান্তরিত হয়। এই পানি ফের বাষ্প উৎপাদন প্রকোষ্ঠে প্রবাহিত হতে থাকে এবং আবার বাষ্পে পরিণত হয়। পানি ও বাষ্প সমেত এই দ্বিতীয় চক্রটির নাম দ্বিতীয় সার্কিট।

এই বর্ণনায় আমরা দুটি প্রশ্নের উত্তর দিই নি। এক : কেন দ্বিতীয় সার্কিটের পানি ফুটতে আরম্ভ করে এবং বাষ্পে পরিণত হয়? আর প্রথম সার্কিটে কোনো বাষ্পই-বা নেই কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে : এ-ধরনের দুটি সার্কিটের প্রয়োজন হয় কেন? পারমাণবিক চুল্লি থেকে কি সরাসরি বাষ্প তৈরি করে নেওয়া যায় না?

প্রথম প্রশ্নটির উত্তর মোটামুটি সহজেই দেওয়া যায়। প্রথম সার্কিটে পানি ফুটে না, কারণ পানি ওখানে থাকে ভীষণ চাপের মধ্যে। আর চাপ যত বেশি হয়, পানি ফুটানোর জন্য তা তত বেশি গরম করার দরকার হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব একটু দীর্ঘ। ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস বিভাজনের সময় অসংখ্য 'টুকরো' ও কণা সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন দিকে উড়ে যেতে থাকে। এই প্রবাহকেই বলা হয় বিকিরণ (Radiation)। পারমাণবিক বিকিরণ জীবজগতের সবকিছুর জন্যই ক্ষতিকর। এজন্যই পারমাণবিক চুল্লির চারদিকে সব সময় কণকটের মোটা দেয়াল তৈরি করা হয়। সেই দেয়াল নির্মাণ জীবতাত্ত্বিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থারই একটি অংশ।

পারমাণবিক শক্তি ব্যবস্থায় পানির দুটি সার্কিট রাখা হয় বিকিরণজনিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই। প্রথম সার্কিটের পানি বিকিরণ দ্বারা কলুষিত তথা তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং ইউরেনিয়ামেরই মতো তা থেকে বিকিরণ ঘটে। এই

এই নতুন মৌলিক পদার্থটির নাম রাখা হলো পুটোনিয়াম, সৌরমণ্ডলে নেপচুনের পরবর্তী গ্রহ পুটো-এর নামানুসারে। দেখা গেল, পুটোনিয়াম তেজস্ক্রিয় হলেও মোটামুটি স্থিতিশীল। এর নিউক্লিয়াস আলফা-কণা নিঃসরণ করে ভেঙে যায়, কিন্তু এই ভাঙনের হার এতই অল্প যে—অর্ধেক সংখ্যক নিউক্লিয়াস ভেঙে যেতে সময় লাগে ২৪০০০ বছর।

মজার ব্যাপার হলো, পুটোনিয়াম নিউক্লিয়াসগুলোও ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর মতো নিউট্রন বিশোষণ করে নিয়ে ভেঙে যায়। এর অর্থ পুটোনিয়াম নিউক্লিয়াস-এর বিভাজন ঘটে এবং ইউরেনিয়াম-২৩৫ নিউক্লিয়াসের মতো ধীরগতি নিউট্রনই এই বিভাজনের জন্য বেশি কার্যকর। ইউরেনিয়াম-২৩৮ থেকে পুটোনিয়াম-২৩৯ সৃষ্টি হলেও এদের রাসায়নিক ধর্ম ভিন্ন অর্থাৎ এরা আলাদা দুটি মৌলিক পদার্থ। ফলে রাসায়নিক উপায়ে মোটামুটি সহজেই এদের আলাদা করে নেওয়া যায়। অথচ ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর ক্ষেত্রে এই সুবিধা নেই। তবে পুটোনিয়ামের একটি অসুবিধাও আছে। এই অসুবিধা হলো—বাতাসের সংস্পর্শে এতে আগুন ধরে যায়। তাই এটি নাড়াচাড়া করার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

ত্বরণ-যন্ত্র বা অ্যাকসিলারেটর

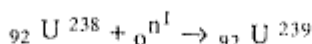
রাদারফোর্ডই সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে একটি মৌলিক পদার্থকে ভিন্ন মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তেজস্ক্রিয় উপাদান রেডিয়াম থেকে নির্গত বেগবান আলফা-কণার সাহায্যে নাইট্রোজেনকে আঘাত করে তিনি অক্সিজেন তৈরি করেন। বেগবান কণার একমাত্র উৎস ছিল তখন তেজস্ক্রিয় উপাদানই। তাই বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন—যদি আলফা-কণার চেয়ে আরো বেশি শক্তিশালী কণা সৃষ্টি করা যায় অথবা অন্যান্য ক্ষুদ্র কণিকাকে যদি কোনো ত্বরণযন্ত্রের সাহায্যে আলফা-কণার মতো দ্রুতগতি করা যায়, তাহলে সেগুলোর দ্বারা আঘাত করে অনেক পদার্থকে কৃত্রিমভাবে রূপান্তরিত করা সম্ভব হতে পারে। অতএব বিজ্ঞানীরা লেগে পড়লেন এ-ধরনের ত্বরণযন্ত্র তথা কণা-অ্যাকসিলারেটর তৈরি করার কাজে।

১. ভ্যান-ডি-গ্রাফ জেনারেটর

কণা-ত্বরণযন্ত্র নির্মাণে প্রথম সাক্ষ্য লাভ করেন রবার্ট ভ্যান-ডি-গ্রাফ। ১৯৩১ সালে তিনি একটি বৈদ্যুতিক জেনারেটর নির্মাণ করেন যার সাহায্যে সর্বোচ্চ ১.৫ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব হয়। এই উচ্চ বিভবের সাহায্যে চার্জযুক্ত কণাতে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হলো। আধুনিক ভ্যান-ডি-গ্রাফ জেনারেটরে ১০ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট (10 MeV) পর্যন্ত বিভব (potential) অর্জন সম্ভব। ঢাকার পরমাণু-

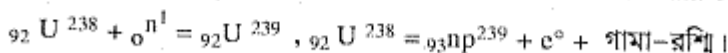
ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন, ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজন, শৃঙ্খল-বিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা ১৯৪১ সালে প্লুটোনিয়াম নামে একটি মৌল তৈরি করতে সমর্থ হন। তাঁরা দেখতে পেলেন প্লুটোনিয়াম ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর মতোই সরাসরি বিভাজনযোগ্য।

আমরা জানি, ইউরেনিয়াম-২৩৮ আইসোটোপটি নিউট্রন বিশোষণ করে নেয়, কিন্তু তবু এটি বিভাজিত হয় না। এক্ষেত্রে ইউরেনিয়ামের আরেকটি ভারী আইসোটোপ অর্থাৎ ইউরেনিয়াম-২৩৯ সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়টিকে আমরা নিম্নরূপে দেখাতে পারি :



অতিরিক্ত একটি নিউট্রন নিউক্লিয়াসে এসে পড়ায় ইউরেনিয়ামের এই নতুন ভারী পরমাণুটি বেশ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। তখন সেটি নিউট্রনের অতিরিক্ত ভার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিউক্লিয়াস থেকে একটি ইলেকট্রন নিঃসরণ করার মাধ্যমে একটি নিউট্রনকে প্রোটনে রূপান্তরিত করে নেয়। এতে নিউক্লিয়াসের ভরসংখ্যা ২৩৯-ই থেকে যায়, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা একটি কমে গিয়ে প্রোটনের সংখ্যা একটি বেড়ে যায়। অতএব এটি নতুন একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়, যার প্রোটন সংখ্যা ৯৩। পর্যায়সারণিতে এর স্থান হবে ইউরেনিয়ামের পরেই। এই মৌলিক পদার্থটির নাম দেওয়া হলো নেপচুনিয়াম। সৌরজগতে ইউরেনাস গ্রহটি আবিষ্কৃত হওয়ার আট বছর পর ইউরেনিয়াম আবিষ্কৃত হয়েছিল। তখন ইউরেনাসের নাম অনুসরণ করেই ইউরেনিয়ামের নামকরণ করা হয়। ঐ নামকরণ অনুসারেই নতুন মৌলিক পদার্থটির নাম রাখা হয় নেপচুনিয়াম, যেহেতু সৌরমণ্ডলে ইউরেনাসের পরে আবিষ্কৃত গ্রহটিই হলো নেপচুন।

নেপচুনই হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট ইউরেনিয়ামের চাইতে ভারী প্রথম মৌলিক পদার্থ। এই নেপচুনিয়াম সৃষ্টির সময় ইলেকট্রন নিঃসরণ ছাড়াও গামা-রশ্মির নির্গমন ঘটে। তাই নেপচুনিয়াম সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি :



ইউরেনিয়াম থেকে নেপচুনিয়াম তৈরির পরপরই দেখা গেল, এই নতুন মৌলিক পদার্থটি অস্থির এবং অস্থিতিশীল। নিজের নিউক্লিয়াস থেকে একটি ইলেকট্রন বের করে না-দিয়ে সে মোটেই স্থির হয়ে থাকতে পারছে না। এর অর্থ, নিউক্লিয়াসের একটি নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন একটি নিউক্লিয়াস, যার পারমাণবিক ভর অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু প্রোটন-সংখ্যা বেড়ে হয় ৯৪। অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি হচ্ছে আরেকটি নতুন মৌলিক পদার্থ।

পারমাণবিক চুল্লির ব্যবহার

প্রধানত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যই পারমাণবিক চুল্লি নির্মিত হয়ে থাকে। এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে বলা হয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় ৩০০টির মতো পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে এবং আরও ২০০টির বেশি নির্মাণাধীন রয়েছে। নিম্নে পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত দেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাম্প্রতিক শতকরা পরিমাণ দেখানো হল :

ফ্রান্স	৭০%
বেলজিয়াম	৬৭%
জার্মানি	৩০%
সুইডেন	৩৯%
জাপান	২৫%
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৭%

পারমাণবিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুবিধা হচ্ছে এতে জ্বালানি-পদার্থের খরচ অত্যন্ত কম। যেমন এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে যতটা তাপ পাওয়া যায় ততটা তাপ পেতে হলে দু'হাজার টন কয়লা পোড়াতে হবে। যে-সব দেশে কয়লা বা অন্য প্রকার খনিজ জ্বালানি পাওয়া যায় না সে-সব দেশে পারমাণবিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনই লাভজনক। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা নিচে বর্ণনা করা হলো।

১. সুবিধা

কেন্দ্রের জন্য যে জায়গার প্রয়োজন হয় তার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অত্যন্ত মন্থ পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহৃত হয় বলে পরিবহণ ও সংরক্ষণ খরচ কম। প্রতিকূল আবহাওয়ায়ও কার্যক্ষম থাকে এবং ব্যবহৃত জ্বালানির ৮৭% বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

২. অসুবিধা

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক খরচ বেশি। রক্ষণাবেক্ষণ কাজ কঠিন এবং খরচও বেশি। তাছাড়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সুদক্ষ কারিগর ও প্রকৌশলীর প্রয়োজন হয়। অন্যান্য শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের মতো এখানে অদক্ষ বা আধা-দক্ষ কর্মী দ্বারা কাজ করানো যায় না।

শক্তি কেন্দ্রেও একটি ভ্যান-ডি-গ্রাফ জেনারেটর রয়েছে। গম্বুজাকৃতি শীর্ষবিশিষ্ট এই জেনারেটরটি খুব সহজেই আমাদের চোখে পড়ে যায় প্রথমে। এর ক্ষমতা ১.৫ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট।

২. সাইক্লোট্রন

প্রফেসর আর্নেস্ট ওরল্যান্ডো লরেন্স ও এম. এস. লিভিংস্টোন (E. O. Lawrence and M. S. Livingston) ১৯৩১ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইক্লোট্রন নামে একটি কণা-ত্বরণযন্ত্র নির্মাণ করেন। সাইক্লোট্রনের সাহায্যে ৮ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট (৪ MeV) শক্তিবিশিষ্ট প্রোটন, ১৬ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট (16 MeV) শক্তিবিশিষ্ট ডয়টেরন এবং ৩২ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিবিশিষ্ট (32 MeV) আলফা-কণা উৎপাদন করা সম্ভব। তবে সাইক্লোট্রনের একটি অসুবিধা হচ্ছে, এটি কেবল একটি নির্ধারিত বা সীমিত শক্তির মধ্যেই ব্যবহার করা চলে।

৩. সিনক্রো-সাইক্লোট্রন

সাইক্লোট্রনের অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীদের গবেষণা অব্যাহত থাকে। অবশেষে সাইক্লোট্রনের একটি উন্নততর রূপ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলি গবেষণাগারে নির্মাণ করা সম্ভব হয়। এর নাম দেওয়া হয় সিনক্রো-সাইক্লোট্রন ত্বরণযন্ত্র। এই ত্বরণযন্ত্রের সাহায্যে ২০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট (200 MeV) শক্তিসম্পন্ন ডয়টেরন এবং ৮০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট (800 MeV) শক্তিসম্পন্ন আলফা-কণা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল।

৪. বিটট্রন

ইলেকট্রন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রফেসর কার্স্ট (D. W. Kerst) ১৯৪০ সালে 'বিটট্রন' নামে একটি কণা-ত্বরণযন্ত্র আবিষ্কার করেন। বিটট্রনে ৩৪০ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট (340 MeV) শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। আধুনিক বিটট্রনগুলো অবশ্য প্রধানত শক্তিশালী এক্স-রশ্মি উৎপাদনের জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে কৃত্রিম বিভাজনের ক্ষেত্রেও বিটট্রনের ব্যবহার খুব কম নয়।

পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে বর্তমানে আরো বেশি শক্তিশালী কণা-ত্বরণযন্ত্র নির্মিত হয়েছে। এসব ত্বরণযন্ত্র প্রধানত নিউক্লিয়াসের গঠন এবং মৌলিক কণিকা সম্পর্কিত উচ্চতর গবেষণা কার্যেই ব্যবহৃত হয় বেশি। এই সমস্ত গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা বহু নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন এবং অনেক তত্ত্বের পরীক্ষামূলক প্রতিপাদনও সম্ভব হয়েছে। বস্তুত পরমাণু বিজ্ঞানের গবেষণায় কণা-ত্বরণযন্ত্র একটি শক্তিশালী ও অপরিহার্য হাতিয়ার।

কিন্তু দুর্ঘটনার ব্যাপারটিকে অন্যভাবে দেখলে আমরা একথাও বলতে পারি— পারমাণবিক চুল্লি বা রিয়ার্টার নির্মাণ সম্ভব হওয়ার পর থেকে প্রায় ৪৫ বছরের মধ্যে পারমাণবিক চুল্লির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা ঘটেছে মাত্র দু'বার। এবং এতে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর সংখ্যা বেশি নয়। পক্ষান্তরে কয়লা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বছরে গড়ে মৃত্যুর সংখ্যা ৩০০ জনের মতো। অতএব জ্বালানি সজ্জার কারণেই অদূর ভবিষ্যতে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা ছাড়া গতানুগতিক নেই, কেননা বিকল্প উৎস উদ্ভাবনে এখনো বড় ধরনের কোনো সাফল্য অর্জিত হয়নি। সৌরশক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত রয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সৌরশক্তি ব্যবহার সম্ভব বলে মনে করা হলেও বড় ধরনের সৌরশক্তি কেন্দ্র নির্মাণের ব্যাপারে যথাযথ প্রযুক্তিগত সাফল্য এখনো অর্জিত হয় নি। অতএব পরমাণু-শক্তি বর্জন করার বিষয়টি এই মুহূর্তে আমরা চিন্তা করতে পারি না।

পারমাণবিক শক্তির আর একটি অনবদ্য ব্যবহার দেখা যায় বরফ-ভাঙা জাহাজে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে টারবাইন পরমাণুর শক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে, আর বরফ-ভাঙা জাহাজের টারবাইন পরমাণুর শক্তিকে রূপান্তরিত করে গতিতে। ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে সোভিয়েত বরফ-ভাঙা জাহাজ 'আর্কটিকা' (সুমেবু) বরফের রাজ্য অতিক্রম করে একেবারে উত্তর মেরুতে গিয়ে পৌঁছেছিল। এর আগে আর কোনো বরফ-ভাঙা জাহাজের পক্ষেই তা করা সম্ভব হয় নি।

সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজেও পরমাণু-শক্তি ব্যবহার বেশ সুবিধাজনক। পরমাণু-শক্তি চালিত ডুবোজাহাজ একনাগাড়ে দীর্ঘকাল ধরে পানির নিচে থাকতে পারে, কারণ বারবার জ্বালানি নেওয়ার জন্য সেটিকে পানির উপরে ভেসে উঠতে হয় না।

লবণহীন পানি

পরমাণু-শক্তি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মানুষের বিশেষ উপকারে আসবে। সেটি হচ্ছে সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা দূরীকরণ। আজ পৃথিবীতে লবণহীন পানির পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। মানুষ নানা কাজে লবণহীন পানি ব্যবহার করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাই মানুষের দৈনন্দিন কাজে ক্রমশ বেশি পরিমাণ লবণহীন পানি খরচ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই খরচ সত্ত্বেও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় লবণহীন পানির সজ্জা দেখা দিত আরো অনেক পুরে। আসলে সারা বিশ্বে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপিত হচ্ছে; এইসব শিল্পের জন্য ক্রমশ অধিক পরিমাণে পানি ব্যবহার করতে হচ্ছে এবং এই পানির পরিমাণ অনেক। অতএব সুলভে লবণহীন পানি পাওয়ার একটি ব্যবস্থা এখন একান্তই প্রয়োজন।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রধানত সেসব দেশেই স্থাপন করা হয়েছে, যে-সব দেশে এর জ্বালানি পাওয়া যায় কিংবা অনুরূপ জ্বালানি সংগ্রহের সামর্থ্য যে-সব দেশের রয়েছে। তাছাড়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিষয়টিও বিচেনার মধ্যে রাখতে হবে। পারমাণবিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার মতো প্রয়োজনীয় জনশক্তি না-থাকলে এ ধরনের শক্তিকেন্দ্র নির্মাণ বা পরিচালনা অবশ্যই কঠিন হয়ে পড়ে।

জ্বালানি সজ্জট ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

শক্তি উৎপাদনের জন্যে সারা বিশ্বে প্রধানত খনিজ জ্বালানিই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এসব খনিজ জ্বালানির মধ্যে রয়েছে ঃ কয়লা, তেল, গ্যাস ইত্যাদি। সারা বিশ্বে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তার ৯০% এখনো এ-ধরনের জ্বালানি থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। অবশিষ্ট ১০% এর মধ্যে ৫% বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদিত হয় পানি-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে এবং ৫% উৎপন্ন হয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে। কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে এ অবস্থাটি থাকবে না বলেই সবার ধারণা। তখন প্রায় অর্ধেক পরিমাণ বিদ্যুৎ আসবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকে। আর একটি কথা এখানে বলে নেওয়া ভালো যে, বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি তৈরি হয়েছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ওবিনিৎস্ক শহরে, কালগার কাছে। এই কেন্দ্রটিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয় ১৯৫৪ সালে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ব্যাপারে ইদানীং বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা যাচ্ছে অনেক দেশেই। এর কারণ—পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনার ফলে বিকিরণজনিত বিপদ। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে দুটি। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে ১৯৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যানসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের থ্রি-মাইল আইল্যান্ডে। দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটে ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে। চেরনোবিলে অবস্থিত পারমাণবিক চুল্লির এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে ৩১ জনের। এ ছাড়া বিকিরণজনিত অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়েছে প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ। এই দুর্ঘটনার ফলে বিকিরণজনিত ক্রিয়া প্রায় ৩ থেকে ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, চেরনোবিল দুর্ঘটনার ফলে পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশেই খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যে বিকিরণের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং এর ফলে বিশ্বব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়।

সার। এমনকি অতিরিক্ত ১০ মিলিয়ন একর জমিতে ব্যবহারের মতো সার এখন থেকে রপ্তানিও করা যাবে। তাছাড়া চুল্লিতে ব্যবহারের পর অমলিন অর্থাৎ অতেজস্ক্রিয় উষ্ণ পানি সাগরে ফেললে সেখানে মাছের সমাবেশও ঘটবে প্রচুর। ভারতের কুচ এলাকায় এ ধরনের একটি প্রকল্প নির্মাণের সম্ভাব্যতা ইতোমধ্যেই যাচাই করে দেখা হয়েছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে ষাট দশকের শেষদিকে একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পাবনা জেলার রূপপুর নামক স্থানে ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনক্ষম একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এই কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং প্রাথমিক কিছু নির্মাণ-কার্য ও সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধার কারণে প্রকল্পটির কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং এখনো তা বন্ধই আছে। তবে প্রকল্পটির কাজ পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে ইদানীং নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।

ঢাকার অদূরে সাভারস্থ পরমাণু-শক্তি কেন্দ্রে বর্তমানে ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পারমাণবিক চুল্লি স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালে চুল্লিটি চালু করা হয়। এটি প্রধানত গবেষণা-কার্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

পরমাণু-শক্তির বিবিধ ব্যবহার

পরমাণু-শক্তির ব্যবহার কেবল বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই বললেই চলে যেখানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে না। তবে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে তেজস্ক্রিয়তার বিষয়টি আমরা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে নিতে চাই।

আমরা জানি, ফরাসি বিজ্ঞানী আঁরি বেকেরেল ১৮৯৬ সালে প্রথম সাধারণ ইউরেনিয়াম ধাতুতে এই তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পান। বেকেরেলের এই আবিষ্কারের পর পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে অনেক বিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে শুরু করেন। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জানা গেল—তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে রশ্মি নির্গত হয়—সেগুলো তিন প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন রশ্মি। গ্রীক বর্ণমালার প্রথম তিনটি বর্ণের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়েছে—আলফা (α), বিটা (β) ও গামা (γ) রশ্মি।

পৃথিবীর পানির প্রধান ভাগের হচ্ছে সাগর-মহাসাগর। কিন্তু সে পানি লবণাক্ত। সমুদ্রের পানি ব্যবহারের আগে তা লবণমুক্ত করা প্রয়োজন। কাজটি করা হয় এভাবে : লবণাক্ত পানি ফুটানো হয়। তা থেকে বাষ্প উঠতে থাকে। এই বাষ্প একটি কন্ডেন্সারে তথা বাষ্প-ঘনীভবনকারী আধারে জমা করে ঠাণ্ডা করলেই লবণহীন পানি পাওয়া যায়। অতঃপর স্বাদের জন্য তাতে সামান্য লবণ মেশানো হলেই তা খাওয়া যায় এবং তা দিয়ে গোসল করা যায় কিংবা সে-পানি সেচকার্যেও ব্যবহার করা যায়। এদিকে যে আধারটিতে পানি ফুটানো হয় তার তলায় কিছু তলানি বা ‘কাইট’ পড়ে থাকে। এই ‘কাইট’ সরিয়ে তাতে আবার সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ঢালা হয়। আবার সে পানি ফুটানো হয়। অন্যদিকে কাইটগুলোতে পাওয়া যায় ম্যাঙ্গানিজ, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি মূল্যবান পদার্থ, সোনাও পাওয়া যায় কিছু।

কিন্তু সমুদ্রের পানি লবণহীন করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ শক্তি। আর এই শক্তি যোগাতে পারে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো। সোভিয়েত ইউনিয়নে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বতীরে শেভচেঙ্কোতে নির্মিত হয়েছিল এমনই একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এখানে উৎপাদিত বিদ্যুৎ-শক্তির প্রায় সমস্তটাই ব্যবহৃত হয় সমুদ্রের লবণাক্ত পানি পরিশোধনের কাজে। এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হওয়ার ফলে উৎপত্ত মরুভূমিতে অবস্থিত শেভচেঙ্কো শহরটির চেহারাটিই বদলে গেছে পুরোপুরি। এখানে এখন আছে প্রচুর পানি। আরও আছে ছায়াছন্ন বীথি আর ফোয়ারা। শহরের সর্বত্র রয়েছে বর্ণাঢ্য শোভার ফুলবাগান। এছাড়া কাইট থেকে প্রাপ্ত সোডিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি ব্যবহার করে বেশ কিছু শিল্পও গড়ে উঠেছে।

এ ধরনের প্রকল্প গড়ে তোলার বিষয়টি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকরিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে চালানো হয়েছে ব্যাপক সমীক্ষা। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে—কৃষি ও অন্যান্য কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যায় না এমন সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাহায্যে কৃষিকাজ ও শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলা যায়। সেচকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করা যাবে সমুদ্রের লবণাক্ত পানিকে লবণহীন করে। তাছাড়া উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত লবণাদি ব্যবহার করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে নানা ধরনের শিল্প-প্রতিষ্ঠান। সমীক্ষায় একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া গেছে তা হলো—প্রকল্পটি প্রতিদিন ১০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে এবং লবণহীন করতে পারবে ৪০০ মিলিয়ন গ্যালন পানি। এছাড়া সমুদ্রের পানি থেকে প্রতিদিন পাওয়া যাবে ২০০ টন অ্যামোনিয়া ও ৩৬ টন ফসফরাস। ২ লক্ষ একর জমিতে সেচের জন্য প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যাবে এই প্রকল্পটি থেকে এবং সমুদ্রের পানি থেকেই উৎপাদন করা যাবে এই পরিমাণ জমিতে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয়

তারা পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম পৃথক করতে সমর্থ হলেন এবং দেখলেন যে, এ দুটি পদার্থ ইউরেনিয়ামের চাইতেও বেশি সক্রিয়। এই সময়ে শিট স্বতন্ত্রভাবে থোরিয়াম ও তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন।

তেজস্ক্রিয়তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এই প্রক্রিয়া যে কোনো তাপমাত্রায়, যে কোনো চাপে সমুদ্র বা ভূ-ভূকের গভীরে সর্বদাই ঘটছে। বস্তুত এই প্রক্রিয়ার উৎস হচ্ছে মৌলের নিউক্লিয়াস। অতএব কোনো ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তবে একটি কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, সকল তেজস্ক্রিয় মৌল হতে একই সঙ্গে আলফা, বিটা বা গামা-রশ্মি নির্গত হয় না।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের কোনোটি থেকে নির্গত হয় শুধু আলফা-রশ্মি, আবার কোনোটি থেকে নির্গত হয় শুধু বিটা-রশ্মি। অবশ্য কোনো কোনো তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে আলফা-রশ্মি ও বিটা-রশ্মি দুটিই বেরিয়ে আসে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলফা ও বিটা নির্গত হওয়ার সময় গামা-রশ্মিও বেরিয়ে আসে।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া

আলফা কণিকা দ্বারা কোনো কোনো মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটালে নিউট্রন বেরিয়ে আসে তা জানার জন্য গবেষণা করতে গিয়ে ১৯৩৪ সালে আইরিন কুরী ও তাঁর স্বামী ফ্রেডারিক জুলিও একটি যুগান্তকারী প্রতিভাস আবিষ্কার করেন। এটি হচ্ছে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা। তাঁরা লক্ষ করেন যে, বোরন ও অ্যালুমিনিয়ামকে আঘাত করে আলফা-কণিকার উৎস দূরে সরিয়ে রাখলে প্রোটন ও নিউট্রন নিঃসরণ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু কিছু সময় পর্যন্ত নতুন ধরনের রশ্মি নির্গত হতে থাকে। চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল যে, এই নতুন রশ্মি আসলে পজিটিভ ইলেকট্রন বা পজিট্রন। অর্থাৎ এভাবে বোরন ও অ্যালুমিনিয়ামের রূপান্তরের মাধ্যমে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় উপাদান সৃষ্টি হয়।

এ ধরনের কৃত্রিম রূপান্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ তৈরিও সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে, মৌলিক পদার্থের ১৩০০ আইসোটোপের মধ্যে প্রায় ৮০০ আইসোটোপ তেজস্ক্রিয়।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার এজন্যই অত্যন্ত সুবিধাজনক যে, আয়ুষ্কালে তারা অবিরাম রশ্মি বিকিরণ করে। ফলে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যেখানেই থাকুক না কেন, যন্ত্রের সাহায্যে তাদের সরাসরি ঝুঁজে বের করা সম্ভব। তাই বিভিন্ন কাজে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলোকে দু'ভাবে ব্যবহার করা হয় : (১) তেজস্ক্রিয় রশ্মি নিঃসরণের উৎস হিসেবে, এবং (২) তেজস্ক্রিয়া সন্ধানী (tracer) হিসেবে।

আলফা-রশ্মি

আলফা-রশ্মি আসলে আলফা-কণার নিরন্তর প্রবাহ। এই কণার চার্জের পরিমাণ হচ্ছে একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চার্জের দ্বিগুণ। আর এর ভর হচ্ছে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের চারগুণ। পর্যায়-সারণির হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসের সাথে আলফা-কণার হুবহু মিল রয়েছে। রাদারফোর্ড একটি সহজ ও সুন্দর পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে, আলফা-কণা আসলে হিলিয়াম-নিউক্লিয়াস ছাড়া অন্য কিছু নয়।

বিটা-রশ্মি

বিটা-রশ্মিও একপ্রকার কণিকার নিরন্তর উৎসার। চৌম্বক ক্ষেত্রে বিটা-কণিকার বিক্ষেপণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিটা-কণিকায় নেগেটিভ চার্জ রয়েছে। অতঃপর বিটা-কণার চার্জ ও ভরের অনুপাত থেকে দেখা গেল যে, বিটা-কণা আসলে ইলেকট্রন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

গামা-রশ্মি

আলফা-কণা অথবা বিটা-কণার মতো গামা-রশ্মির কোনো বৈদ্যুতিক চার্জ নেই। গামা-রশ্মি আসলে এক্স-রশ্মির মতোই তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ, তবে এক্স-রশ্মির চাইতে গামা-রশ্মি অনেক বেশি শক্তিশালী।

তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য

বেকেরেলের আবিষ্কারের পর মাদাম কুরী ও তাঁর স্বামী পিয়েরে কুরী পিচব্লেন্ড নামক ইউরেনিয়াম আকরিকজাত ধাতু নিয়ে নিরলস গবেষণায় নিমগ্ন হলেন। পিচব্লেন্ড হচ্ছে ইউরেনিয়াম, বিস্মাথ, বেরিয়াম ও সীসার সমষ্টি। রাসায়নিক উপায়ে পিচব্লেন্ড থেকে ইউরেনিয়াম আলাদা করে তাঁরা দেখলেন যে, তখনো পিচব্লেন্ড থেকে অজ্ঞাত রশ্মি নির্গত হচ্ছে। এবার তাঁরা পিচব্লেন্ডের বিস্মাথ ও বেরিয়ামও আলাদা করে দেখলেন যে, বিস্মাথ ও বেরিয়ামের ভগ্নাংশ দুটি থেকে অজ্ঞাত রশ্মি নির্গমন অব্যাহত রয়েছে। অথচ বিশুদ্ধ বেরিয়াম বা বিস্মাথ পৃথকভাবে পরীক্ষা করে তাঁরা দেখতে পেলেন যে, সেগুলো থেকে এ-ধরনের কোনো রশ্মি নির্গত হয় না। তখন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে নিলেন যে, বিস্মাথ ও বেরিয়ামের প্রত্যেকটি ভগ্নাংশে নিশ্চয়ই এমন অজ্ঞাত কোনো ধাতু রয়েছে, যেগুলির রাসায়নিক গুণাবলি বিস্মাথ ও বেরিয়ামের অনুরূপ। তাঁরা অনুমিত পদার্থদ্বয়ের নাম দিলেন পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম। কঠোর পরিশ্রম ও নিরলস সাধনার মাধ্যমে

শিল্পক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার

শিল্পক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার এখন প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পজাত দ্রব্যাদির গুণগত মান নির্ণয় এবং শিল্প-কারখানায় কর্মীদের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। ধাতব দেয়াল বা প্লেটের বেধ জানার জন্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। মোটরগাড়ি অথবা বিমানের টায়ার, ঘরবাড়ি রঙ করার রঙ, গাঁথুনির কংক্রিট ইত্যাদি কতখানি মজবুত তা নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে পর্যবেক্ষক আইসোটোপ।

কোনো কোনো শিল্পে মেশিন চলার সময় নানা প্রকার বিস্ফোরক গুঁড়ো সৃষ্টি হয়। সেসব ক্ষেত্রে ঘর্ষণের ফলে স্থিরবিদ্যুতের সৃষ্টি খুবই বিপজ্জনক। এই সময় স্থিরবিদ্যুৎ বিস্ফোরক গুঁড়োগুলোকে আকর্ষণ করে নিয়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এইসব কারখানায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে স্থিরবিদ্যুৎ অপসারণ করা যায় এবং এর ফলে মারাত্মক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ নির্মাণে কোনো ত্রুটি আছে কি না, ঢালাইয়ে কোনো খুঁত রয়ে গেছে কি না এবং ইস্পাত নির্মিত পাইপ লাইন ইত্যাদিতে কোনো ত্রুটি আছে কি না ইত্যাদি নির্ণয়ের ব্যাপারে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বিশেষভাবে কাজে লাগানো যায়।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বিভিন্নমুখী ব্যবহার প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর ব্যবহার এত ব্যাপক ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে যে ‘নিউক্লীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান’ বা ‘নিউক্লিয়ার মেডিসিন’ (Nuclear Medicine) নামে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন একটি শাখাই বর্তমানে গড়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে আরো বহু ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার সম্প্রসারিত হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন। এর ফলে পরমাণু-শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য মানবজাতির প্রত্যাশা পূরণ হবে বলেই আমরা আশা করতে পারি।

নিউক্লীয় ফিউশন (Nuclear Fusion)

একটি ভারী নিউক্লিয়াসের বিভাজনের ফলে যেমন পারমাণবিক শক্তি পাওয়া যায়, তেমনি একাধিক হালকা নিউক্লিয়াসের পারস্পরিক সংযোজনের ফলেও বিপুল পারমাণবিক শক্তি উৎপন্ন হয়। হালকা নিউক্লিয়াসসমূহের এই সংযোজনকে বলা হয় ফিউশন (Fusion) বা বিগলন। নিউক্লিয়াসের এই মিলনের ব্যাপারটি চিন্তা করা যতটা সহজ বাস্তবে তা ঘটানো কিন্তু মোটেই তেমন নয়। কেন ? এর উত্তরটিও অবশ্যই নিউক্লিয়াসের মধ্যেই নিহিত।

কয়েকটি ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। বলা বাহুল্য, এ ধরনের ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের বাংলাদেশেও বিশেষ গবেষণা চলছে। কৃষিক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ফসফেট জাতীয় সারের সাথে তেজস্ক্রিয় ফসফরাস মিশ্রিত থাকলে এই সার গাছের বৃদ্ধির কোন স্তরে কি কাজ করছে তা সহজেই নির্ণয় করা যায়। এ ছাড়া ধান, পাট, ভুট্টা, গম, তামাক, তুলা ইত্যাদির বীজকে উপযুক্ত মাত্রার তেজস্ক্রিয় রশ্মির, বিশেষ করে গামা রশ্মির প্রভাবাধীনে আনা হলে তাদের মধ্যে গভীর জননতাত্ত্বিক পরিবর্তন আসে। এরূপ জননতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন জাতের খাদ্যশস্যের সার্থক বংশবৃদ্ধি কৃষিবিজ্ঞানে এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা করেছে।

ফসল নষ্টকারী কীট-পতঙ্গগুলোর পুরুষ জাতিকে পরীক্ষাগারে প্রচুর সংখ্যায় লালন-পালন করে বড় করে নিয়ে তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবাধীন করলে তারা বন্ধ্যা বা নির্বীজ হয়ে যায়। এর ফলে তারা বংশবৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। এই পদ্ধতিতে ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিংবা কোনো বিচ্ছিন্ন এলাকায় এদের নির্মূলও করা যায়।

খাদ্যশস্য সংরক্ষণে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। সংরক্ষণাগারে যে সকল কীট-পতঙ্গ ও পোকা-মাকড় খাদ্যশস্য নষ্ট করে তাদেরকে গামা-রশ্মি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া যায়। তেজস্ক্রিয় রশ্মি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হলে খাদ্যশস্যের স্বাদ ও পুষ্টিগুণ নষ্ট হয় না। এ ছাড়া পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, খুব অল্পমাত্রার গামা-রশ্মি দ্বারা আলু ও পেঁয়াজের মঞ্জরিত হওয়া বিলম্বিত করা যায়। গামা-রশ্মির সাহায্যে কোনো কোনো ফল বেশ কিছুদিন তাজা অবস্থায় রাখা যায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার

উপযুক্ত মাত্রায় তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগ করে জীবন্ত কোষ সরাসরি ধ্বংস করা যায় কিংবা গুরুতরভাবে নষ্ট করা যায়। তেজস্ক্রিয় রশ্মির এই ক্ষমতা বিশেষভাবে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় মোটামুটি সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া সোডিয়াম ক্রোমাইড বা খাওয়ার লবণের সাথে তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম-২৪ মিশ্রিত থাকলে লবণ পাকস্থলীতে পৌঁছার পর কত দ্রুত শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে তা নির্ণয় করা যায়। অন্যদিকে কার্বন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে জীবিত কোষগুলোর ভিতর কি কি জটিল ঘটনা এবং প্রক্রিয়া চলছে বিজ্ঞানীরা সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন।

একমাত্র এরূপ উত্তাপের মধ্যেই ডিউটেরিয়াম নিউক্লিয়াসগুলো হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হবে এবং আমরাও নিউক্লীয় ফিউশনজনিত শক্তি পেতে পারব।

কিন্তু এরূপ উত্তাপে প্রকৃতির সমস্তকিছু বাষ্পীভূত হয়ে যায়। পরিণত হয় গ্যাসে, প্রাজমায়ে। সে ক্ষেত্রে যে পাণ্ডটিতে ডিউটেরিয়াম উত্তপ্ত করা হবে তাও গ্যাসে পরিণত হবে। অর্থাৎ কাজটি করা অসম্ভব। এই অসম্ভব কাজটি সম্ভব করার একটি প্রক্রিয়ার কথা চিন্তা করেছেন বিজ্ঞানীরা। তা—ই হচ্ছে—প্রাজমাকে চৌম্বক ক্ষেত্রে ধরে রাখা। চৌম্বক ক্ষেত্র উত্তপ্ত প্রাজমাকে চেপে সরু ফিতের মতো করে রাখে। এর ফলে প্রাজমা—ফিতে এবং যন্ত্রের দেয়ালের মাঝখানে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ফলে দেয়ালগুলো আস্ত ও অক্ষত থেকে যায়।

চৌম্বক শক্তির চাপের ফলে নিউক্লিয়াসগুলো একটি স্তূপে এসে জড়ো হয়। এতে তারা পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায়, পরস্পরের সাথে মিলিত হয় এবং শক্তি নিঃসৃত করে।

কিন্তু আসল কথা হলো—পুরো ব্যাপারটিই এখনো স্বপ্নই রয়ে গেছে, কারণ আজ পর্যন্ত ডিউটেরিয়ামকে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা মোটেই সম্ভব হয় নি। তবে রুশ বিজ্ঞানীরা ‘তকামাক’ নামে একটি সিরিজ যন্ত্রের সর্বশেষ মডেলে ইতোমধ্যে ২ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।

প্রকৃতিতে অবশ্য এই নিউক্লীয় সংযোজন প্রক্রিয়া বা তাপ-নিউক্লীয় প্রক্রিয়া অনবরত ঘটে চলেছে। আর মানুষও চিরকাল ধরে ব্যবহার করে আসছে এই তাপ-নিউক্লীয় শক্তি। তবে এই তাপ-নিউক্লীয় চুল্লিটি বা রিঅাক্টরটি আমাদের পৃথিবীতে নেই, আছে আমাদের মাথার উপর ঝুলে। আর তা হচ্ছে আমাদের অতি পরিচিত, অতি প্রিয় সূর্য। সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা মোটামুটি দু’কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৯৩৯ সালে বিজ্ঞানী হান্স বেথে (Bethe) ও ভাইসেকার (Weizsacker) সর্বপ্রথম বলেন যে, সূর্যের অভ্যন্তরের প্রচণ্ড উত্তাপে তাপ-নিউক্লীয় (thermo-nuclear) প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পরিণত হচ্ছে হিলিয়ামে।

প্রক্রিয়াটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁরা এভাবে। সূর্যের উপাদানের ৩৫ ভাগ হাইড্রোজেন। এছাড়া কার্বন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি পদার্থও সূর্যে রয়েছে। সূর্যের কেন্দ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে হাইড্রোজেন পরমাণু ইলেকট্রন হারালে প্রোটনে পরিণত হয়। এই তীব্রগতিসম্পন্ন প্রোটন এবং অনুরূপ তীব্রগতিসম্পন্ন কার্বন-১২ নিউক্লিয়াসের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটলে প্রোটনটি কার্বন-১২ নিউক্লিয়াসে ঢুকে পড়ে। কার্বন-১২ নিউক্লিয়াস তখন পরিণত হয় নাইট্রোজেন-১৩ নিউক্লিয়াসে। এ-সময় নির্গত হয় গামা-রশ্মি। এই

আমরা জানি, পরমাণুর নিউক্লিয়াস পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট। অতএব দুটি নিউক্লিয়াসকে কাছে আনার চেষ্টা করা হলে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ ঘটবে এবং এই বিকর্ষণ-বল কাটিয়ে নিউক্লিয়াসের সংযোজন ঘটানো অবশ্যই কঠিন একটি কাজ।

কিন্তু আমাদের জানা আছে, কোনো বায়বীয়, তরল অথবা কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থটির অণুগুলোর অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় এবং সেগুলো ভেঙে গিয়ে পরমাণুতে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ‘থার্মাল ডিসোসিয়েশন’ বা তাপীয় বিয়োজন। তাপীয় বিয়োজনের ফলে উৎপন্ন পরমাণুগুলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চারদিকে ছুটাছুটি করতে থাকে এবং এর ফলে এদের গতিশক্তিও অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এই দ্রুতগতির ফলে পরমাণুগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ ঘটে এবং এরূপ সংঘর্ষের ফলে পরমাণু থেকে ইলেকট্রন অপসারিত হয়। অপসারিত ইলেকট্রনগুলো এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকে এবং কোনো কোনোটি আবার চার্জ-নিরপেক্ষ পরমাণুর সাথে জড়িত হয়ে যায়। তাই অত্যধিক তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থ তার সাধারণ অবস্থা হারিয়ে ফেলে এবং তা তখন দিকভ্রান্ত, উন্মত্ত ও দ্রুতগতি পজিটিভ ও নেগেটিভ পরমাণু বা আয়নের সমাবেশে পরিণত হয়। এইরূপ অবস্থায় পদার্থকে বলা হয় প্লাজমা। অর্থাৎ সাধারণভাবে বলা যায় প্লাজমা হচ্ছে পদার্থের কণিকা আর টুকরোর মিশ্রণ : ইলেকট্রন, নিউট্রন, নিউক্লীয় টুকরো এবং পরমাণুর পুরো একটি নিউক্লিয়াস। এর সবগুলোই বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত।

নিউক্লীয় ফিউশনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানীরা এই চার্জের সুযোগটিই গ্রহণ করলেন। সেটি হচ্ছে প্লাজমাকে চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা। কিন্তু প্লাজমাকে এভাবে ধরে রাখার প্রয়োজনই বা কেন হয় ? সে কাহিনী জানার জন্য আমাদের একটি পেছনে যেতে হয় বৈকি।

অনেক আগে থেকেই জানা আছে যে, ভারী হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু একত্রিত করলে পাওয়া যায় নতুন একটি উপাদান—হিলিয়াম। ভারী হাইড্রোজেনকে বলে ডিউটেরিয়াম। ডিউটেরিয়াম নিউক্লিয়াসের সংযোগে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি হওয়ার সময় অনেক শক্তিও নিঃসৃত হয়। এই শক্তির পরিমাণ সম্পর্কে একটু ধারণা করা যাক : এক কিলোগ্রাম ডিউটেরিয়াম যে পরিমাণ শক্তি যোগাতে পারে সেই পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ কিলোগ্রাম কয়লা পুড়িয়ে। শক্তির কী বিপুল সমাবেশ।

কিন্তু ডিউটেরিয়ামের দুটি নিউক্লিয়াস একত্র করার কাজটি খুবই কঠিন। এজন্য ডিউটেরিয়ামকে ২০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উত্তপ্ত করার প্রয়োজন হয়।

হাইড্রোজেন বোমা

নিউক্লীয় ফিউশনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের শক্তিকেন্দ্র এখানে তৈরি করা যায় নি। তবে কাজটি যে অসম্ভব নয় তার প্রমাণ হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার। হাইড্রোজেন বোমার ক্ষেত্রে যে নীতিটি অনুসৃত হয়, তা হলো ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম বোমার বিস্ফোরণের মুহূর্তে বিস্ফোরণ-কেন্দ্রে যে অত্যুচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপ সৃষ্টি হয় সেই তাপ ও চাপ কাজে লাগানো। হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন তিন রকম। এগুলো হচ্ছে : (১) নিউক্লিয়াসে কেবল একটি প্রোটন থাকে, (২) নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন থাকে, এবং (৩) নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন থাকে। প্রথম রূপটিই হচ্ছে সাধারণ হাইড্রোজেনের রূপ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপটিকে বলা হয় ডয়টেরন (D) ও ট্রাইটন (T)। তবে ডয়টেরন এবং ট্রাইটন অত্যন্ত বিরল রূপ।

হাইড্রোজেন বোমার অভ্যন্তরে একটি সাধারণ পারমাণবিক বোমা বা ফিশন বোমা এবং ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের একটি পাত্র থাকে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে উত্তাপের সৃষ্টি হয় আর সেই উত্তাপে ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের মধ্যে তাপ-নিউক্লীয় বিক্রিয়া শুরু হয়। এই বিক্রিয়া শুরুর পর তা নিজের উত্তাপের মাধ্যমেই অব্যাহত থাকে।

১৯৫২ সালের ১লা নভেম্বর আমেরিকার বিজ্ঞানীরা মার্শাল দ্বীপে প্রথম হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হন। এটির সাংকেতিক নাম ছিল 'মাইক' (Mike) এবং বোমাটির ওজন ছিল প্রায় ৬৫ টন। এই বোমাটি ছিল দশ মেগাটন শক্তির বোমা অর্থাৎ হিরোশিমায় ব্যবহৃত বোমার চেয়ে প্রায় ৬০০ গুণ বেশি শক্তিশালী। ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১ মেগাটন শক্তিবিশিষ্ট হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এটি মাইকের চেয়ে কম শক্তিশালী হলেও বরং বেশি আধুনিক ও বহনযোগ্য ছিল।

নটে গাছটি মুড়োলো

রূপকথার গল্পে নটে গাছটি সব সময় মুড়োয়। কিন্তু পরমাণু-শক্তির কাহিনী শেষ হয় না। এই শতাব্দীর ত্রিংশের দশকে কিছু মৌলিক কণা আবিষ্কারের ফলে পদার্থের গঠন সম্পর্কে চূড়ান্ত ধারণা পাওয়া গেছে—একথা অনেকেই মনে করেছিলেন। বিশ্ব রহস্য সমাধানের চাবিকাঠি চলে এসেছে মানুষের হাতের মুঠোয়—এ কথাও ভাবতে শুরু করেন অনেকে। কিন্তু পরমাণু এবং নিউক্লীয় জগৎ নিয়ে গবেষণা যত এগিয়েছে

নাইট্রোজেন-১৩ নিউক্লিয়াসটি যেমন স্থায়ী হয় না, তেমনি তা নাইট্রোজেন-১৪ নিউক্লিয়াসের মতো নিষ্ক্রিয়ও থাকে না। এটি তেজস্ক্রিয় হয় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি পজিট্রন (e^+) উৎক্ষেপণ করে স্থায়ী কার্বন-১৩ নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

এরপর আরও একটি প্রোটন এই নবগঠিত কার্বন-১৩ নিউক্লিয়াসের সাথে সংঘর্ষ ঘটিয়ে সেটিকে নাইট্রোজেন-১৪-তে রূপান্তরিত করে। এবার নাইট্রোজেন-১৪'র সঙ্গে আরও একটি প্রোটনের সংঘর্ষের ফলে তা তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন-১৫ তে পরিণত হয়। কিন্তু তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন-১৫ অনতিবিলম্বে একটি পজিট্রন উৎক্ষেপণ করে একটি স্থায়ী নাইট্রোজেন-১৫তে রূপান্তরিত হয়। সর্বশেষে নাইট্রোজেন-১৫ আরও একটি প্রোটনের সাথে সংঘর্ষ ঘটিয়ে ভেঙে যায় এবং এই ভাঙনের ফলে কার্বন-১২ ও হিলিয়াম-৪ সৃষ্টি হয়।

উপরের বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, কার্বন-১২ থেকে এই জটিল প্রক্রিয়াটি শুরু হয় এবং এর সমাপ্তিও ঘটে আবার কার্বন-১২ তে এসেই। অর্থাৎ এই বৃত্ত-প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলাফল হচ্ছে—কার্বন কার্বনই এবং নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনই থেকে যায়। এর মধ্যে চারটি প্রোটন অংশ নেয় এবং পরিণামে শেষ পর্যন্ত একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। অর্থাৎ সমগ্র জটিল প্রক্রিয়াটির মধ্যে চূড়ান্তভাবে পরিবর্তন ঘটে হাইড্রোজেনের এবং গঠিত হয় হিলিয়াম। সূর্য্যভ্যন্তরের এই তাপ-নিউক্লীয় প্রক্রিয়াকে ‘কার্বন-নাইট্রোজেন চক্র’ নামে অভিহিত করা হয়, যেহেতু প্রক্রিয়াটিতে প্রতিটি পর্যায়েই কার্বন নাইট্রোজেনে এবং নাইট্রোজেন কার্বনে রূপান্তরিত হয়। এভাবে একটি হিলিয়াম সৃষ্টির সময় ২৫ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি নির্গত হয়।

আধুনিক মতানুসারে প্রাথমিক পর্যায়ে সৌরশক্তির উদ্ভব হয়। প্রোটন-চক্রের মাধ্যমে এবং কার্বন-নাইট্রোজেন চক্র পরবর্তী পর্যায়ে সংঘটিত হয়। অতএব এই চক্রেও চারটি প্রোটনের সংযোজন ঘটে একটি আলফা-কণা ও দুটি পজিট্রন উৎপন্ন হয়। তাই চারটি প্রোটনের সংযোজনে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠিত হয়ে প্রায় ২৫ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি উৎপাদিত হয়।

নিউক্লীয় ফিউশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিপুল শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা বিজ্ঞানীদের সামনে নতুন দিগন্ত প্রসারিত করে দিয়েছে। পৃথিবীতে প্রচলিত জ্বালানি শক্তি ক্রমশ নিঃশেষিত হয়ে আসছে। তাই নিউক্লীয় ফিউশন প্রক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি আহরণ সম্ভব হলে আরও পাঁচ হাজার কোটি বছর ধরে জ্বালানির কোনো সঙ্কটই থাকবে না পৃথিবীতে।

ততই বস্তুবিশ্বের গঠন আরও জটিলতর বলে মনে হচ্ছে বিজ্ঞানীদের কাছে। তবুও এ কথা সত্য—পরমাণু-শক্তি আমাদের জন্যে খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার অসীম দিগন্ত। আগামী দিনগুলোয় সেই দিগন্তেই ছুটে যাবে মানুষ—মানুষের জয়যাত্রা থাকবে অব্যাহত। কিন্তু মানুষকে মনে রাখতে হবে, ধ্বংস নয়, মানব কল্যাণের কাজেই ব্যবহার করতে হবে পরমাণু-শক্তি; তা না হলে মানুষ নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে নিজের সৃষ্টির হাতে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. আহমদ হোসেন ও ড. গাজী সিরাজুল ইসলাম, *পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬।
২. এ. এইচ. এম. হাবিবুল ইসলাম, *পরমাণুর রাজ্য*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬।
৩. রবার্ট ফ্রঙ্ক (অনুবাদ : আবুল বাশার), *সহস্র সূর্যের আলো*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।
৪. প্রসাদ সেনগুপ্ত, *পরমাণু-বোমা*, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন্স (প্রা.) লিঃ, কলিকাতা, ১৯৮৭।
৫. অ্যালেক্সেই ক্রিপোভ (অনুবাদক : বিজয় পাল), *রিঅ্যাক্টরের ইতিকথা*, রাঢ়ীয়া প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪।

ততই বস্তুবিশ্বের গঠন আরও জটিলতর বলে মনে হচ্ছে বিজ্ঞানীদের কাছে। তবুও এ কথা সত্য—পরমাণু-শক্তি আমাদের জন্যে খুলে দিয়েছে সম্ভাবনার অসীম দিগন্ত। আগামী দিনগুলোয় সেই দিগন্তেই ছুটে যাবে মানুষ—মানুষের জয়যাত্রা থাকবে অব্যাহত। কিন্তু মানুষকে মনে রাখতে হবে, ধ্বংস নয়, মানব কল্যাণের কাজেই ব্যবহার করতে হবে পরমাণু-শক্তি; তা না হলে মানুষ নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে নিজের সৃষ্টির হাতে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. আহমদ হোসেন ও ড. গাজী সিরাজুল ইসলাম, *পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬।
২. এ. এইচ. এম. হাবিবুল ইসলাম, *পরমাণুর রাজ্য*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬।
৩. রবার্ট ফ্রঙ্ক (অনুবাদ : আবুল বাশার), *সহস্র সূর্যের আলো*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।
৪. প্রসাদ সেনগুপ্ত, *পরমাণু-বোমা*, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন্স (প্রা.) লিঃ, কলিকাতা, ১৯৮৭।
৫. অ্যালেক্সেই ক্রিলোভ (অনুবাদক : বিজয় পাল), *রিঅ্যাক্টরের ইতিকথা*, রাঢ়াণা প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪।

banglainternet.com